Amra O Crab Nebula by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
আমড়া ও
ক্র্যাব
নেবুলা
www.MurchOna.com
মূর্ছনা

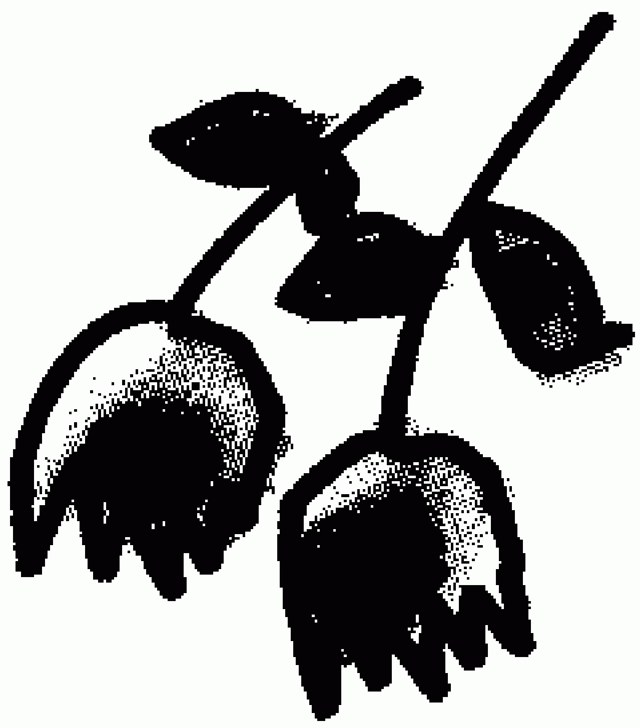

উৎসর্গ

তিথি সোনা
চাঁদের কণা

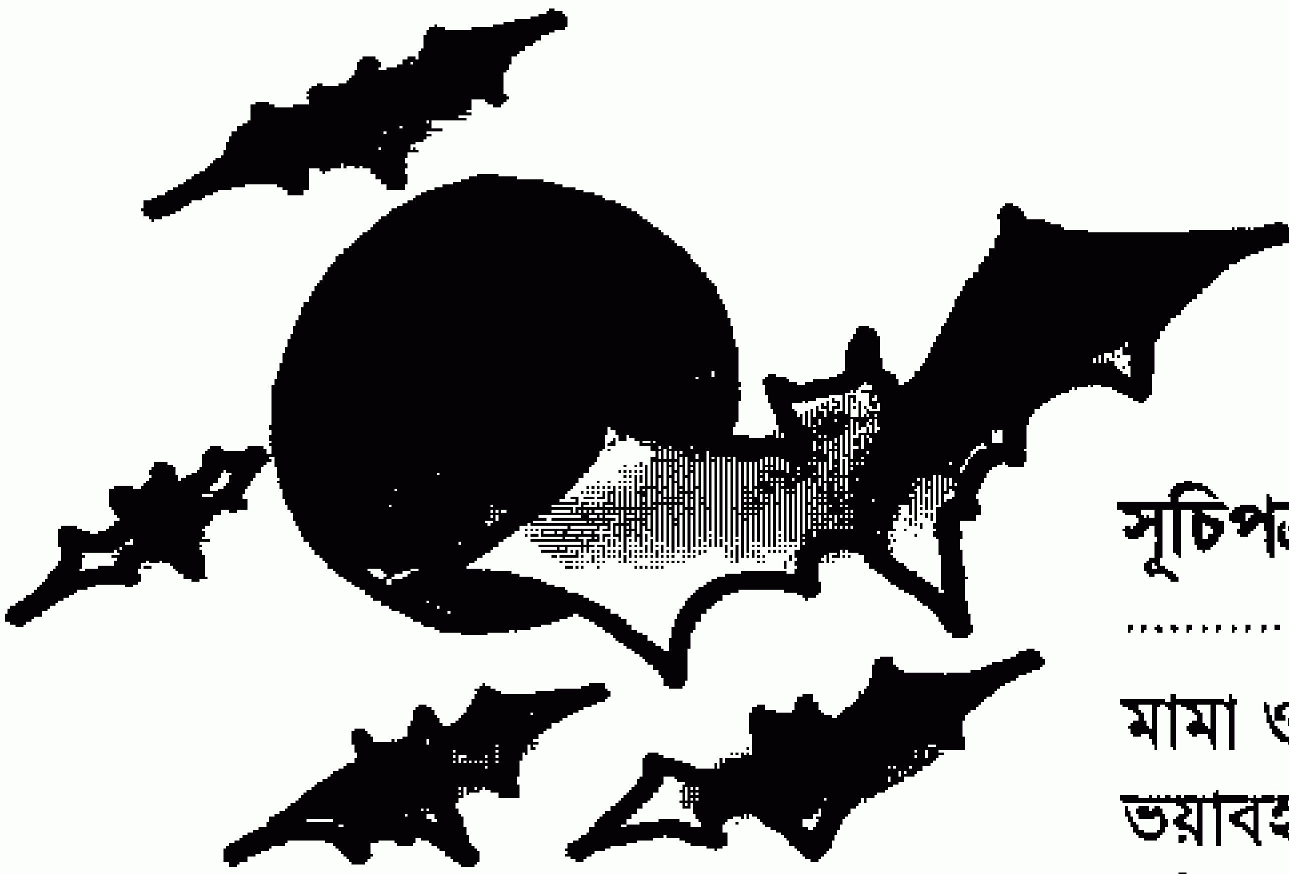

সূচিপত্র

মামা ও তার ফ্রিজ/৯
ভয়াবহ নানা/১৬
ছবি/২৪
ছক্কা/৩২
বিলু ও তার মৌমাছি/৪০
মূর্তি/৪৮
সবুজ গুণ্ডা ও দিলু সাইন্টিস/৬৩
আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা/৬৯

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

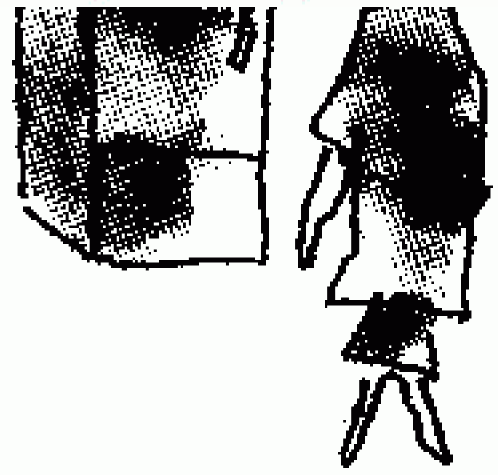

মামা ও তার ফ্রিজ

রাজুর বোন বকুলের বিয়ে ঠিক হয়েছে। পরিবারের প্রথম বিয়ে, তাই সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি হইচই। বিয়ের কার্ডে কী লেখা হবে সেটা ঠিক করতেই ইউনিভার্সিটির তিন জন বাংলার বাঘা বাঘা প্রফেসরের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। কার্ড ছাপানোর পর মা রাজুকে ডেকে বললেন, রাজু বাবা তুই একবার সিলেট যা।

সিলেট? রাজু চোখ কপালে তুলে বলল, সিলেট কেন?

তোর মামা আছেন, বিয়ের একটা কার্ড দিয়ে আয়।

গিয়ে দিয়ে আসতে হবে কেন? পোস্ট করে দিলেই হয়।

মা জিবে কামড় দিয়ে বললেন, ছিঃ! সবকিছুর একটা নিয়মনীতি আছে না! বিয়ের কার্ড হাতে হাতে দিতে হয়।

রাজু মুখ শক্ত করে বলল, বেশ! তাহলে একটা প্লেনের টিকিট কিনে দাও আমেরিকা গিয়ে ছোট চাচার বিয়ের কার্ডটাও দিয়ে আসি। আসার সময় ডিজনিল্যান্ডটাও দেখে আসব।

মা চোখ পাকিয়ে বললেন, ফাজলামি করবি না। যা বলেছি কর। ট্রেনে যাবি–আসবি তোর সমস্যাটা কোথায়?

কাজেই রাজুকে বিয়ের কার্ড নিয়ে সিলেট দৌড়াতে হল। সে কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। এই বয়সটার নানারকম যন্ত্রণা, ছোট বলে আলাদা করে কেউ আর আলাদা করে খাতির–যত্ন করে না, আবার বড় হয়ে গেছে বলে কেউ স্বীকার করে না। যত রকমের নোংরা কাজগুলো তার ঘাড়ে এসে পড়ে। সিলেট যাওয়া অবশ্যি ঠিক নোংরা কাজের মাঝে পড়ে না। সত্যি কথা বলতে কী সে এই দায়িত্বটা পেয়ে বেশ খুশিই হয়েছে, না হলে তাকে ডেকোরেটরের কাছে আর দর্জির কাছে দৌড়াদৌড়ি করতে হত। তাছাড়া মামার সাথে অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, একটু পাগলাটে মানুষ—কিন্তু তাদের খুব আদর করেন।

প্রায় সারাদিন ট্রেনে বসে থেকে রাজু সিলেট পৌঁছল বিকেলবেলা। ট্রেন থেকে নেমে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

দেখল মামা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। ছোটখাটো মানুষ, চেহারায় একটা গোলগাল ভাব রয়েছে। বড় বড় গোঁফ এবং মাথায় বিস্তৃত টাক। রাজুকে দেখে মামা ভারি খুশি হলেন। বললেন, তুই তো বড় হয়ে গেছিস দেখি! টেলিফোনে বলল তুই একা আসছিস, আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম—বাচ্চা ছেলে একা আসছে মানে?

রাজু হেসে বলল, না মামা আমি আর বাচ্চা ছেলে নাই।

মামা বললেন, চল যাই। যাবার আগে চট করে একটু দেখে আসি।

কী দেখবে মামা?

ডিজেল ইঞ্জিনটা। কী একটা ইঞ্জিন, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

তখন রাজুর মনে পড়ল মামা হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার। যন্ত্রপাতি দেখলেই তার মুখে পানি এসে যায়।

দুজনে হেঁটে হেঁটে ট্রেনের সামনে ইঞ্জিনের কাছে হাজির হল। মামা ইঞ্জিনটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, কান পেতে কী শব্দ শুনলেন তারপর কেমন জানি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। রাজু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে মামা?

লো কোয়ালিটি তেল। পিস্টন করোড করে যাচ্ছে।

তুমি বুঝলে কেমন করে?

মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, বোঝা যায়। যন্ত্রপাতিকে বোঝা কোনো কঠিন ব্যাপার না। যন্ত্রপাতিকে বুঝতে হলে তাদের ভালবাসতে হয়। আর যন্ত্রপাতিকে ভালবাসলেই দেখবি তারা তোর সাথে কথা বলতে শুরু করেছে।

রাজু চোখ কপালে তুলে বলল, কথা বলতে শুরু করেছে?

হ্যাঁ। সবাই মনে করে যন্ত্রপাতির কোনো অনুভূতি নেই। বাজে কথা, একেবারে বাজে কথা। সব যন্ত্রপাতিরই অনুভূতি আছে।

অনুভূতি আছে?

হ্যাঁ। কেউ কেউ ঠাণ্ডা মেজাজের কেউ কেউ বদরাগী। এই যে ইঞ্জিনটা দেখে এলাম সে হচ্ছে বদরাগী! রাগে একেবারে ফোঁৎ ফোঁৎ করছে। যদি ভালো মেনটেনেন্স করে মেজাজ ঠাণ্ডা না করে রেল কোম্পানির বিপদ আছে।

কী বিপদ মামা?

খবরের কাগজে যে দেখিস ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয় তার মানে কী? তার মানে হচ্ছে কোনো ইঞ্জিন রেগেমেগে লাইনের বাইরে লাফিয়ে যাচ্ছে। তাই হবে আবার।

মামার সাথে হেঁটে হেঁটে রাজু ভিড় ঠেলে বাইরে এল। একপাশে ইট রঙের একটা ভোক্সওয়াগন গাড়ি, মামা তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রাজু চোখ বড় বড় করে বলল, গাড়ি কিনেছ মামা?

মামা লাজুক মুখে হেসে বললেন, কিনলাম একটা। কেনার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু না কিনে পারলাম না।

কেন মামা?

আমার কলিগের গাড়ি ছিল এটা। এত অত্যাচার করত যে আর বলার মতো নয়, গাড়িরও তো একটা মান-অভিমান থাকতে পারে। সেও নড়ত না। কোনোদিন সাইলেন্সার পাইপ ভাঙা, কোনোদিন ফুয়েল লাইন জ্যাম, কোনোদিন কার্বুরেটরে ময়লা, কোনোদিন

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

অয়েল পাম্প অচল—আমার কলিগ বিরক্ত হয়ে বিক্রি করে দিতে চাইল। এই গাড়ি কে কিনবে? শেষ পর্যন্ত আমি কিনে নিলাম। আমি আদর-যত্ন করে রাখি, কোনো সমস্যা নেই।

মামা গাড়ির দরজা খুলে দিলেন, রাজু ভিতরে গিয়ে বসল। পিছনের সিটে রাজুর ব্যাগটা রেখে মামাও বসলেন। চাবি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করার চেষ্টা করতেই গাড়ির ইঞ্জিন কয়েকবার ঘোঁ ঘোঁ শব্দ করে থেমে গেল। মামা রাজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখছিস, রেগে গেছে!

রেগে গেছে?

হ্যাঁ। আসতে দেরি করলাম যে।

রাজু একটু অবাক হয়ে মামার দিকে তাকাল, এতক্ষণ মনে করছিল মামা বুঝি ঠাট্টা তামাশা করছেন কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মামা সত্যি সত্যি বলছেন। রাজু ঢোক গিলে বলল, এখন কী করবে?

দেখি কী করা যায়। মামা তখন গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে হাত বুলিয়ে মুখ দিয়ে চুক চুক ধরনের এক রকম শব্দ করলেন, ছোট বাচ্চাদের আদর করার সময় মায়েরা যেরকম শব্দ করে অনেকটা সেরকম। গাড়ির বনেটে থাবা দিয়ে বললেন, আরে বোকা মেয়ে! রাগ করার কী আছে? স্টার্ট নিতে কেউ আপত্তি করে নাকি?

মামা রাজুর দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপে আবার স্টার্ট করার চেষ্টা করলেন, গাড়ি এবারে স্টার্ট নিয়ে নিল। মামা এক গাল হেসে বললেন, এই তো চাই! গুড গার্ল। বাসায় চল আজকে তোমার সব স্পার্ক প্লাগ পরিষ্কার করে দেব।

স্টেশন থেকে বের হয়ে সুরমা ব্রিজ পার হয়ে মামা শহরে ঢুকলেন। রাস্তাঘাটে খুব ভিড়, মামা খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছেন। প্রত্যেকবার একটা স্পিডব্রেকার পার হচ্ছিলেন আর গাড়িটাকে জিজ্ঞেস করছিলেন সে ব্যথা পেয়েছে কি না। রাজু আস্তে আস্তে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে যাচ্ছে যে মামা সত্যিই গাড়িটার সাথে কথাবার্তা বলছেন। এর মাঝে কোনো ঠাট্টা তামাশা নেই।

একটা বাজারের কাছাকাছি এসে মামা গাড়ি থামালেন। রাজুকে বললেন, এটা হচ্ছে আম্বরখানা। আয় একটু বাজার করে নিই।

কী বাজার করবে?

বাসায় কিছুই নেই। সবকিছু কিনতে হবে। মাছ মাংস শাকসবজি। দেখি কই মাছ পাওয়া যায় কি না। বড় কই মাছ থেকে খেতে ভালো আর কী আছে?

কাঁটার জন্যে যে রাজু কই মাছ খেতে পারে না সেটা সে সাহস করে বলতে পারল না। মামা খুব হইচই করে বাজার করলেন। দরদাম করেন না। কিন্তু কেনার আগে নানারকম ভয়ভীতি দেখান যে তার থেকে বেশি দাম নিলে তিনি সাংঘাতিক কিছু একটা করে ফেলবেন! সেই সাংঘাতিক কিছু একটা যে কী সেটা তিনি কখনোই পরিষ্কার করে বলেন না। কিন্তু মনে হয় তাতে একটু কাজ হয়—জিনিসপত্রের দাম আধাআধি হয়ে নেমে আসে।

বাজার করে বাসায় ফিরে আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে গেল। মামার বাসাটি খুব সুন্দর, একটা টিলার উপরে ছবির মতো একটা বাসা। মামা বিয়ে করেন নি, একা একা থাকেন কিন্তু চারদিক একেবারে ঝকঝক করছে। বাসায় ঢোকার আগে দেখা গেল দরজার

www.MurchOna.com

কাছে উদ্বিগ্ন মুখে একজন মানুষ বসে আছে। মামা জিজ্ঞেস করলেন, কী হল ইদরিস মিয়া?

লোকটা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, ইঞ্জিনঘরে সমস্যা স্যার। বড় বয়লারটাতে হাইপ্রেসার হয়ে লালবাতি জ্বলে গেছে। তখন সবগুলো পাম্প বন্ধ হয়ে গেছে আর চালু করা যাচ্ছে না। প্রোডাকশন বন্ধ।

মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, একদিন আমি নাই আর তোমরা সিস্টেম ডাউন করে ফেলেছ?

ইদরিস মিয়া নামের লোকটা মাথা চুলকে বলল, কী করব স্যার সবাই তো চেষ্টা করছে। ফারগুসন সাহেব নিজে এসে গেছেন।

মামা ধমক দিয়ে বললেন, রাখ তোমার ফারগুসন! তোমাদের ধারণা বিদেশি এক্সপার্ট হলেই সবকিছু হয়ে যায়। ওরা যন্ত্রপাতির জানে কী?

ইদরিস মিয়া কাঁচুমাচু মুখে বলল, বড় সাহেব আপনাকে টেলিফোনে না পেয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে এক্ষুনি নিয়ে যেতে বলেছেন।

মামা রাগী রাগী গলায় বললেন, আমি যেগুলো করতে বলেছিলাম সেগুলো করা হয়েছে?

কী কী বলেছিলেন স্যার?

বয়লারের ডানদিকে একটু তেল পড়ে আছে সেটা পরিষ্কার করা হয়েছে?

এখনো করা হয় নাই।

মামা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, এখনো পরিষ্কার কর নাই? তোমাদের আমি কতবার বলেছি বড় বয়লার খুব খুঁতখুঁতে, একটু ময়লা হলে তার মেজাজ গরম হয়ে যায়। সে যে প্রেসার বাড়িয়ে পুরোটা ফাটিয়ে দেয় নাই তোমাদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য।

লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মামা রাগে থমথম করতে করতে বললেন, হাইড্রলিক পাম্পে এক কোয়ার্ট তেল দেয়ার কথা ঠিক তিনটার সময়। দেয়া হয়েছিল?

ঠিক তিনটার সময় দেওয়া হয় নাই, দশ মিনিট দেরি হয়েছিল।

মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, দশ মিনিট! কেন দশ মিনিট দেরি হয়েছে সেটা কেউ হাইড্রলিক পাম্পকে বুঝিয়ে বলেছে?

না স্যার, কেউ পাম্পের সাথে কথা বলতে রাজি হল না। আমি বলেছিলাম স্যার।

মামার মুখ আরো রাগী হয়ে গেল। তিনি চোখ লাল করে বললেন, আজকে কন্ট্রোল রুমে কে আছে?

হাসান সাহেব স্যার।

হাসান সাহেব? তার গানের ক্যাসেট নিয়ে এসেছে?

জি স্যার।

হিন্দি গান শুনছে?

জি স্যার।

মামা রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন, হুংকার দিয়ে বললেন, আমি কতবার নোটিশ দিয়েছি কন্ট্রোল রুমে হিন্দি গান শোনা যাবে না? শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত, কতবার বলেছি? কন্ট্রোল প্যানেলের কম্পিউটার আজেবাজে হিন্দি গান সহ্য করতে পারে না। তোমরা জান না?

জানি স্যার। আমিও বলেছি, আমার কথা কেউ শুনতে চায় না। হাসাহাসি করে।

হাসাহাসি করে! মামা দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, হাসাহাসি করা আমি বের করছি। সব ব্যাটার বিরুদ্ধে আমি একশান নেব। চাকরি নট করে দেব।

মামা রাজুকে বাসায় রেখে ইদরিস মিয়াকে নিয়ে তার ফ্যাক্টরিতে গেলেন। মামা সেই ফ্যাক্টরির বড় ইঞ্জিনিয়ার। সবকিছু তার নিজের হাতে তৈরি করা। যাবার আগে মামা রাজুকে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন। ফ্যাক্টরিতে সিস্টেমটাকে আবার চালু করে কিছুক্ষণের মাঝেই চলে আসবেন।

রাজু কিছুক্ষণ বাসায় একা একা ঘোরাঘুরি করল। মামা একা থাকেন কিন্তু বাসাটা অনেক বড়। খুব সাজানো গোছানো। বাসার মাঝে যেসব জিনিসপত্র আছে তার মাঝে সবচেয়ে দর্শনীয় হচ্ছে খাবার ঘরে রাখা একটা বিশাল ফ্রিজ। দরজা খুলতেই ফ্রিজের ভিতর থেকে ফোঁস করে একটা শব্দ বের হল, রাজু তো চমকেই উঠল হঠাৎ! মামার সাথে থেকে থেকে সেও কি যন্ত্রপাতির মেজাজ মর্জি রয়েছে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে?

বাজার করে আনা জিনিসপত্র টেবিলের উপর রাখা ছিল। রাজু কোনো কাজ না পেয়ে সেগুলো ফ্রিজের মাঝে ঢুকিয়ে রাখতে শুরু করল। এত বিড় ফ্রিজ সে খুব কম দেখেছে, ভিতরে মনে হয় আস্ত একজন মানুষ এটে যাবে। ফ্রিজটা বিচিত্র, যতবারই দরজা খোলে ফোঁস করে একটা আওয়াজ হয়। শুনে মনে হয় কেউ একজন রেগে উঠে নাক দিয়ে শব্দ করছে!

মামা ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এলেন, হাতে মুখে তেল কালি লাগানো, কিন্তু মুখে এক ধরনের বিজয়ীর হাসি। রাজু জিজ্ঞেস করল, যন্ত্রপাতি কাজ করল মামা?

করবে না কেন? কন্ট্রোল রুমে কণিকার ক্যাসেটটা লাগিয়ে দেবার সাথে সাথে সিচুয়েশান পাল্টে গেল। এক মিনিটের মাঝে তিনটা সেফটি লাইট সবুজ হয়ে গেল। ফারগুসন সাহেবের চোয়াল ঝুলে গেল দেখে।

সত্যি?

হ্যাঁ। বয়লারটা পরিষ্কার করে আদর করে একটা-দুইটা কথা বলা—সাথে সাথে চুঁ চুঁ করে প্রেসার নেমে এল। হাইড্রলিক পাম্পটা নিয়ে অবশ্যি অনেক সমস্যা হল, কিছুতেই রাগ কমতে চায় না। শেষ পর্যন্ত যখন ইঞ্জিনিয়ার এসে পিস্টনটা ধরে মাফ চাইল—

মাফ চাইল?

হ্যাঁ, ভীষণ তার প্রেস্টিজ। এই জন্যে জার্মান যন্ত্রপাতি কিনতে চাই না। কী রকম যে তাদের গোঁ—

হঠাৎ খাবার ঘর থেকে বিদঘুটে একরকম শব্দ হল আর মামা একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। ফ্যাকাসে মুখে বললেন, সর্বনাশ!

রাজু ভয় পেয়ে বলল, কী হয়েছে মামা?

ফ্রিজ!

কী হয়েছে ফ্রিজের?

বদহজম!

মামা খাবার ঘরে ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। রাজুর দিকে তাকিয়ে

www.MurchOna.com

জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি কিছু করেছিস ফ্রিজে?

না তো! শুধু—

শুধু কী?

বাজারগুলো তুলে রেখেছি।

মামা ফ্যাকাসে হয়ে বললেন, সর্বনাশ!

রাজু ভয়ে ভয়ে বলল, কী হয়েছে মামা?

এইটা সাধারণ ফ্রিজ না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রিজ। ভীষণ খুঁতখুঁতে। উনিশ থেকে বিশ হলে কিছু উপায় থাকে না। ফ্রিজের ভিতরে কী আছে না আছে তার উপর নির্ভর করে বদহজম হয়ে যায়। বোতলে করে ট্যাপের পানি রাখা যায় না, ফুটিয়ে রাখতে হয়। মাছ থাকবে দুই নম্বর তাকে, সবজি তিন নম্বরে। সমুদ্রের মাছ রাখা যায় না, চিংড়ি রাখলে এলার্জির মতো হয়ে যায়।

রাজু হতভম্ব হয়ে মামার দিকে তাকিয়ে রইল।

মামা পা টিপে টিপে খাবার ঘরে হাজির হলেন। মামাকে দেখেই কি না কে জানে ফ্রিজটা বিকট এক ধরনের শব্দ করে কেঁপে ওঠে, তারপর মানুষের বদহজম হলে পেট যেরকম গুড়গুড় করে ডাকতে থাকে হুবহু সেরকম শব্দ করতে লাগল।

মামা ভয় পাওয়া চোখে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, অবস্থা খারাপ।

এখন কী হবে?

পেট পরিষ্কার করতে হবে। সব খাবার বের করে সেখানে রাখতে হবে পানি। তার মাঝে এক মুঠি চিনি আর এক চিমটি লবণ—

রাজু অবাক হয়ে মামার দিকে তাকাল, সত্যি?

মামা কিছু বলার আগেই আবার ফ্রিজের পেট গুড়গুড় ডেকে উঠল। মামা এগিয়ে গিয়ে ফ্রিজের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, রাগ করিস না বাবা। নতুন এসেছে বুঝতে পারে নি। ঠিক করে দেব আমি। সব ঠিক করে দেব।

ফ্রিজটা আবার ফোঁস করে একটা শব্দ করল। তারপর একটানা গুড়গুড় করে পেট ডাকার মতো শব্দ করতে লাগল। মামা সাবধানে ফ্রিজের দরজা খুলে ভিতর থেকে খাবারদাবার বের করতে লাগলেন। খাবার টেবিলে সেই সব খাবার স্তূপ করে রাখা হল। পুরোটা খালি হবার পর বড় ডেকচিতে করে পরিষ্কার পানি রাখা হল, সেখানে এক মুঠি চিনি আর এক চিমটি লবণ। মামা ফ্রিজের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নরম নরম কথা বলতে থাকলেন।

রাতের খাওয়া পাউরুটি আর জেলি দিয়ে সারতে হল। মামা রাজুকে গিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। তিনি রাতটা ফ্রিজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। পেটটা ভালো হবার পর পরই তাকে সব খাবার তুলতে হবে। খালি পেটে ক্ষুধার্ত ফ্রিজ নাকি ভয়ংকর জিনিস, ব্যাপারটা চিন্তা করেই মামা কেমন জানি শিউরে উঠলেন। রাজু এর মাঝে একবার বকুলের বিয়ে এবং বিয়ের কার্ডের কথা তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠিক সুবিধে করতে পারল না।

নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে রাজু শুনতে পেল মামা নিচে পায়চারি করছেন। ফ্রিজটা মাঝে মাঝে গুড়গুড় করে শব্দ করছে, ফোঁস ফোঁস করছে, কিন্তু আগের থেকে অনেক কম।

www.MurchOna.com

পেট খালি করে সেখানে এক মুঠি চিনি আর এক চিমটি লবণ দিয়ে রাখা পানিতে মনে হচ্ছে সত্যি উপকার হয়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এই ধরনের কিছু যে ঘটতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

রাজু বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখল। ট্রেনের ইঞ্জিন তার সাথে কথা বলছে, একটু পরে পরে বিদঘুটে গলায় ধমক দিচ্ছে, সিলিং ফ্যানটা নাকী সুরে কাঁদতে শুরু করেছে আর হাতে যে ঘড়িটা আছে সেটা চিৎকার করে বলছে, চলব না, চলব না আমি। এর মাঝে হঠাৎ তাকিয়ে দেখে মামার ইটরঙা গাড়িটা কেমন জানি খেপে উঠে দরজায় ঢুস মারতে শুরু করেছে। ধুম ধুম শব্দ হচ্ছে দরজায়।

এ রকম সময়ে রাজুর ঘুম ভেঙে গেল, কিছুক্ষণ লাগল তার বুঝতে সে কোথায়। আস্তে আস্তে মনে পড়ল সবকিছু আর ঠিক তখন সে ধুম ধুম শব্দটা আবার শুনতে পেল, মনে হচ্ছে খাবারের ঘর থেকে আসছে শব্দটা। রাজু বিছানায় উঠে বসে, ভয়ে ভয়ে ডাকল, মামা—

কোনো শব্দ নেই। আবার ধুম ধুম শব্দ শোনা গেল। সাথে ক্ষীণ একটা চিৎকার— শোনা যায় না এ রকম। রাজু খানিকক্ষণ বসে থেকে শেষে বিছানার থেকে নিচে নেমে এসে আবার ডাকল, মামা—

এ বারেও কোনো উত্তর নেই, তবে ধুম ধুম শব্দটা মনে হয় আরো বেড়ে গেছে। রাজু ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে খাবার ঘরের দিকে এগিলে গেল, খাবার টেবিলে এখনো খাবার স্তূপ করা আছে, এক পাশে পানির ডেকচিটা। আশপাশে মামার কোনো চিহ্ন নেই। তাকে দেখেই কি না ফ্রিজটা হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করে ওঠে আর সাথে সাথে ফ্রিজের ভিতর ধুম ধুম করে শব্দ হতে থাকে। রাজুর হঠাৎ মনে হল ফ্রিজের ভিতর থেকে সে যেন কারো গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। রাজু ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে ফ্রিজের দরজাটা স্পর্শ করতেই সে পরিষ্কার শুনতে পেল ফ্রিজটা ঠিক মানুষের মতো একটা ঢেকুর তুলল। সে লাফিয়ে পিছনে সরে আসছিল, কিন্তু তবুও সাহস করে দরজাটা টেনে খুলে ফেলল আর সাথে সাথে মামা ফ্রিজের ভিতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে গড়িয়ে বের হয়ে এলেন, ঠকঠক করে কাঁপছেন শীতে।

মামা, তুমি? ফ্রিজের ভিতরে—

মামা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হারামজাদা ফ্রিজ, এতবার করে বলেছি খাবার দিচ্ছি, ব্যাটার তর সইল না। যেই ভিতরে মাথা ঢুকিয়েছি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ভিতরে আটকে দিল। কত বড় বদমাইশের বাচ্চা দেখেছিস? এটাকে যদি আজি জন্মের মতো একটা শিক্ষা না দেই। পুরো এক মাস যদি এটাকে উপোস করিয়ে না রাখি—

রাজু পরদিন ভোরে মামার বাসা থেকে একরকম পালিয়ে চলে এসেছে। বিয়ের কার্ডটা দেয়ার সময় হয় নি, ঢাকা ফিরে এসে পোস্টঅফিসে গিয়ে মেইল করে দিয়েছে। মা অনেক রাগ করেছেন রাজুর ওপরে, কিন্তু রাজুর কিছু করার নেই। অসতর্ক মুহূর্তে একটা ফ্রিজ তাকে কপাৎ করে গিলে খেয়ে হজম করে ফেলবে সেটা সে হতে দিতে পারে না।

www.MurchOna.com

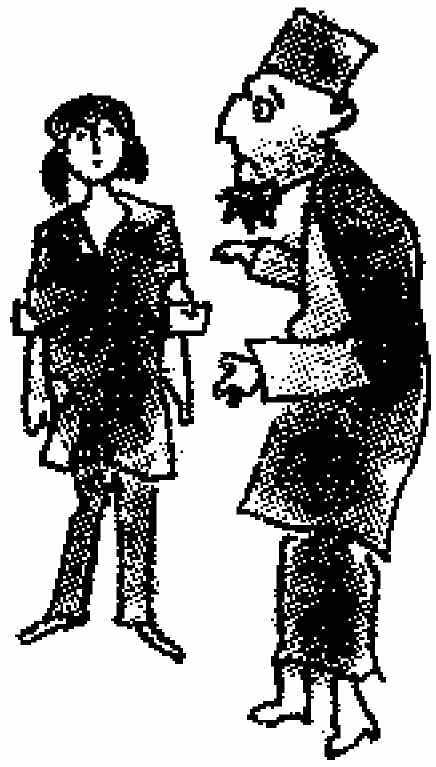

ভয়াবহ নানা

বৃষ্টি আর সাগরের খুব মন খারাপ, আজ নানাবাড়ি থেকে একটা চিঠি এসেছে। সেই চিঠিতে লেখা—তাদের নানা রোজার শুরুতেই চলে আসবেন এবং ঈদ করে ফিরে যাবেন। যারা এই মানুষটাকে দেখেছে শুধু তারাই জানে এটা একটা মহা দুঃসংবাদ। চিঠিটা পেয়ে আব্বার মুখ শক্ত হয়ে গেল, আম্মা কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, কী মজা হবে না?

সাগরের বয়স আট। কখন কী বলতে হয় জানে না, সে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, না, একটুও মজা হবে না।

অন্য সময় হলে আব্বা আর আম্মা সাগরকে একটা শক্ত বকুনি দিতেন, আজকে কিছু বললেন না। আব্বা তার কথা না শোনার ভান করে বললেন, বয়স্ক মানুষ, এতদিন এখানে থাকবেন, কষ্ট হবে না তো?

আম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলে তো আমি আর আসতে না করতে পারি না। কাজেই রোজা শুরু হওয়ার আগেই বৃষ্টি আর সাগরের নানা চলে এলেন। তার বয়স সত্তরের ওপরে। একসময় মনে হয় লম্বা-চওড়া ছিলেন, এখন শুকনো কিশমিশের মতো কুঁকড়ে গেছেন। দাঁত পড়ে গিয়ে গাল ভেঙে গেছে, সামনে দেড়খানা দাঁত, একটা কথা বলার সময় নড়াচড়া করে। থুতনিতে ছাগলের মতো একটু দাড়ি এবং মাথায় টুপি। চোখ দুটি ছোট এবং কুটিল, ভুরু দুটি সবসময় কুঁচকে আছে, পৃথিবীর সবকিছুর ওপরে তিনি সবসময় বিরক্ত হয়ে আছেন।

বৃষ্টি আর সাগর যখন তাকে সালাম করতে গেল নানা তার কুটিল চোখ দুটিকে প্রায় বিষাক্ত করে ফেলে বললেন, বৃষ্টি না? এইটা কী পরে আছিস?

বৃষ্টির বয়স চৌদ্দ। সে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে আজকে তার প্রিয় জিন্সের প্যান্টের সাথে ঢলঢলে একটা টি শার্ট পরে আছে। নিজের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই নানা বললেন, মেয়েলোকের সৌন্দর্য তার সাজপোশাকে না মেয়েলোকের সৌন্দর্য হচ্ছে, লাজ-শরমে। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে এই রকম বেলেল্লাপনা—

www.MurchOna.com

বৃষ্টি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখল। সে অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে—এই লোকের সাথে কথা বলা আর বোলতার চাকে ঢিল মারা মোটামুটি এক ব্যাপার। নানা এরপর সাগরের দিকে তাকালেন এবং মুখ খিঁচিয়ে বললেন, আদব–কায়দা কিছু শিখিস নাই?

সাগর ঠিক বুঝতে পারল না কেন সে গালি খাচ্ছে, কিন্তু সে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, দৌড়ে গিয়ে সালাম করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এরপর থেকে বাসায় মোটামুটি একটা নরকযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। সবচেয়ে প্রথম গান শোনা বন্ধ হল, ইংরেজি তো দূরের কথা বাংলা গানও শোনা যাবে না। গান–বাজনা নাকি শয়তানের জবান। তারপর বন্ধ হল টেলিভিশন। কেউ যদি টেলিভিশন দেখে তাহলে নাকি হাবিয়া দোজখেও তার জায়গা হবে না। তারপর বন্ধ হল গল্পের বই পড়া, বইয়ের নামগুলো দেখেই নানার চোখ উল্টে যাবার অবস্থা। এই সব বই পড়লে তারা নাকি পুরোপুরি উচ্ছন্নে যাবে। শুধু তাই না প্রতিদিন সন্ধেবেলা নানা একটা রুলার নিয়ে তাদের আরবি পড়াতে বসতে শুরু করলেন। বৃষ্টি আর সাগরকে সুর করে "আলিফ জবর আ নু জবর না কাফ মিম পেশ কুম আ–না–কুম" পড়া শুরু করতে হল। একটু ভুল হলেই ঠকাশ করে মাথার মাঝে রুলার দিয়ে একটা বাড়ি। এটাও হয়তো সহ্য করা যেত, কিন্তু একদিন খাবার টেবিলে অত্যন্ত কুৎসিত ভঙ্গিতে খেতে খেতে নানা ঘোষণা করলেন, বৃষ্টি আর সাগরের নাম ঠিক হয় নাই।

আম্মা ভয়ে ভয়ে বললেন, ঠিক হয় নাই?

না। হিন্দুয়ানি নাম।

আব্বা গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, হিন্দুয়ানি তো না এগুলো হচ্ছে বাংলা নাম।

নানা বীভৎস একটা ঢেকুর দিয়ে বললেন, এক কথা। এই নাম ঠিক করতে হবে।

বৃষ্টি আর সাগর কিছু বলল না, আম্মা শংকিত চোখে বললেন, কীভাবে ঠিক করবেন?

নূতন নাম দিতে হবে।

কেউ আর কোনো কথা বলল না। কিন্তু সন্ধে হবার আগেই বৃষ্টি আর সাগরের নূতন নাম দেয়া হল যথাক্রমে গুলবদন আর বিল্লাল। নাম শুনে বৃষ্টির প্রথমে মনে হল সে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে, তারপর মনে হল নানার টুঁটি চেপে ধরবে, কিন্তু সে কিছুই করল না। রাত্রে যখন ঘুমানোর জন্যে নিজের ঘরে হাজির হল থমথমে গলায় ঘোষণা করল, এই বাসায় হয় নানা থাকবে না হয় আমি থাকব।

সাগর ভয়ে ভয়ে বলল, কী করবে আপু?

এক সপ্তাহের মাঝে নানাকে এখান থেকে বিদায় করব। যদি না পারি—

সাগর চোখ বড় বড় করে বলল, যদি না পারি তাহলে কী?

তাহলে আমার নাম পাল্টে ফেলব।

কী নাম হবে?

বৃষ্টি এক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল, গুলবদন!

বৃষ্টি সেদিন থেকেই কাজ শুরু করে দিল। নানাকে যদি এই বাড়ি থেকে দূর করতে হয় তাহলে এখানে তার জীবন অতিষ্ঠ করে দিতে হবে। একজন মানুষের জীবন অতিষ্ঠ

www.MurchOna.com

করার এক শ একটা উপায় রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কিছু একটা করলেই নানা বুঝে ফেলবেন কাজটা কে করছে। তখন বিপদ না কমে মনে হয় আরো বেড়ে যাবে। কে জানে নানা তখন হয়তো তাকে একটা কাটমোল্লার সাথে বিয়ে দেয়ার কথা বলতে থাকবেন— কথাটা চিন্তা করেই বৃষ্টির সারা শরীর শিউরে ওঠে। নানার জীবন অতিষ্ঠ করে দিতে হবে এবং নানা যেন বুঝতে না পারেন সেটা কে করছে। নানার কাছে মনে হবে ব্যাপারটা এমনিতেই হচ্ছে কিংবা—

হঠাৎ বৃষ্টির মুখে হাসি ফুটে উঠল। নানার কাছে মনে হবে ব্যাপারটা করছে ভূতে! নানা হচ্ছেন কুসংস্কারের ডিপো। তার ধারণা পৃথিবীতে ভূতপ্রেত জিন পরী কিলবিল করছে, দোয়াদরুদ পড়ে কোনোভাবে মানুষজন সেখানে বেঁচে আছে। একটু উনিশ-বিশ হলেই কিছু একটা ঘটে যাবে আর জিন ভূত মানুষের ঘাড়ে চেপে বসবে। ঘুমানোর আগে নানা দোয়াদরুদ পড়ে বুকে ফুঁ দেন, হাততালি দেন, দেয়ালে থাবা দেন, তারপর বিকট স্বরে একবার চিৎকার দেন। তার ধারণা, সেই চিৎকার যতদূর থেকে শোনা যায় ততদূর কোনো ভূতপ্রেত আসে না! একজন মানুষ যদি ভূতপ্রেতকে এত গভীরভাবে বিশ্বাস করে তাকে ভূতের ভয় দেখানো কঠিন হবার কথা নয়। নানাকে কীভাবে ভূতের ভয় দেখানো যায় তার নানা ধরনের পরিকল্পনা বৃষ্টির মাথায় খেলতে থাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার চোখে ঘুম আসতে চায় না।

পরদিন ভোরে নানার ঘরটা ভালো করে পরীক্ষা করে বৃষ্টি একটা জিনিস আবিষ্কার করল। সবগুলো ঘরের মাঝেই বৃষ্টির কিংবা অন্য ধরনের পানি বের করার জন্যে একটা ফুটো রয়েছে। নানার ঘরের ফুটোটাতে একটা নল লাগিয়ে সেই নলের আরেক মাথা যদি তারা তাদের নিজেদের ঘরে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তারা সারা রাত একটু পর পর নানাকে বিভিন্ন রকম ভৌতিক আওয়াজ শোনাতে পারবে! যেহেতু তারা নিজেদের ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে কিছুতেই তাদের সন্দেহ করবে না। বেশি বিপদ দেখলে টান দিয়ে নলটাকে টেনে নিজেদের ঘরে নিয়ে আসবে। কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না কেমন করে ব্যাপারটা ঘটেছে!

পরিকল্পনাটা কয়েকবার ভালো করে যাচাই করে বৃষ্টি বিকেলবেলা বের হল। মাকে বলল তার বন্ধু শাওনের বাসায় যাচ্ছে। বাসার কাছেই একটা লোহালক্কড় যন্ত্রপাতির দোকান আছে। কেউ দেখে ফেলবে বলে বৃষ্টি সেখানে গেল না। রিকশা করে বেশ খানিকটা দূরে একটা দোকানে গিয়ে প্রায় দশ গজ প্লাস্টিকের নল কিনল। অনেক সুন্দর সুন্দর রং ছিল; কিন্তু বৃষ্টি কিনল ম্যাটম্যাটে সাদা রঙের, যেন দেয়ালের সাথে মিশে থাকে। নলটা কিনতে গিয়ে অনেকগুলো টাকা বের হয়ে গেল। বইমেলায় বই কিনবে বলে টাকাগুলো বাঁচিয়ে রাখছিল। টাকাগুলো গুনে দিতে গিয়ে তার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল! কিন্তু কী আর করবে!

বাসায় আসতে আসতে সন্ধে হয়ে গেল, প্লাস্টিকের নলটা আজ আর লাগাতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু রাত্রিবেলা একটা সুযোগ এসে গেল। বৃষ্টি আর সাগরের এক দূরসম্পর্কের মামা-মামি বেড়াতে এলেন। সবাই মিলে যখন বাইরের ঘরে বসে কথা বলছে তখন বৃষ্টি সাগরকে পাহারা রেখে বের হয়ে গেল। নলের এক মাথা নানার ঘরের ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য মাথা টেনে আনল নিজেদের ঘরে। বইয়ের সেলফের পিছনে দিয়ে খাটের পাশে দিয়ে একেবারে বিছানায়। সাগরকে প্লাস্টিকের নলে মুখ লাগিয়ে

www.MurchOna.com

একটু শব্দ করতে বলে বৃষ্টি নানার ঘরে গিয়ে হাজির হল—মনে হল নানার খাটের নিচে বসে সাগর শব্দ করছে!

রাতে নানার সব রকম যন্ত্রণা আজ বৃষ্টি আর সাগর মোটামুটি হাসিমুখে সহ্য করল। খেয়েদেয়ে দাত ব্রাশ করে তারা সময়মতো নিজেদের ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অন্যদিন হলে কিছুক্ষণের মাঝেই সাগর ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে যেত, আজ সে জেগে রইল। রাত গভীর হওয়ার পর যখন সবাই শুয়ে পড়ল তখন বৃষ্টি নলটাতে মুখ লাগিয়ে প্রথমে নাকী কান্নার মতো একটা শব্দ করল। খুব জোরে নয় খুব আস্তেও নয়। নানা যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে যেন জেগে ওঠেন সেভাবে। শব্দ শুনে কিছু হল বলে মনে হল না। তখন বৃষ্টি দ্বিতীয়বার নাকী কান্নার শব্দটি করল, আগের থেকে জোরে এবং হঠাৎ তারা শুনল পাশের ঘরে নানা ধড়মড় করে উঠে বসেছেন এবং ভয় পাওয়া গলায় বলছেন, কে? কে?

বৃষ্টি আর সাগর হাসি চেপে শুয়ে রইল। নানা বিছানা থেকে উঠলেন এবং লাইট জ্বালালেন। শব্দ শুনে মনে হল বিছানার নিচে উঁকি মারছেন। সেখানে কিছু না পেয়ে মনে হয় আবার বিছানায় গিয়ে বসেছেন। নলে কান লাগিয়ে বৃষ্টি নানার ঘরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। মনে হল নানা বিড়বিড় করে দোয়াদরুদ পড়ছেন।

বৃষ্টি আবার নলে মুখ লাগিয়ে শব্দ করল। এবারে নাকী কান্নার শব্দ নয় ক্রুদ্ধ কোনো মানুষের গলার স্বর—কেউ যেন খুব রেগে গিয়েছে সেরকম। সাথে সাথে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। নানা লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলেন। তারপর দরজা খুলে প্রায় দুদ্দাড় করে তাদের ঘরে ছুটে এলেন—বৃষ্টি আর সাগর বালিশে মাথা রেখে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে থাকার ভান করল। বৃষ্টি অন্ধকারে প্লাস্টিকের নলটি তার বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখল। হঠাৎ করে যদি নানার চোখে পড়ে যায় মনে হয় মহা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে!

নানা দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় ডাকলেন, গু-গু-গুলবদন।

বৃষ্টি হাসি চেপে শুয়ে রইল। নানা আবার ডাকলেন, গুল-গুল-গুলবদন। বিল্লাল।

দুজনের কেউ কিছু বলল না। নানা তখন ডাকলেন, বিষ্টি।

বৃষ্টি তখন ঘুম থেকে ওঠার ভান করে বলল, কে?

আমি। তোর নানা।

কী হয়েছে নানা?

লাইটটা একটু জ্বালাবি?

বৃষ্টি উঠে লাইট জ্বালাল এবং খুব অবাক হবার ভান করে বলল, কী হয়েছে?

তোরা কি কোনো শব্দ শুনছিস?

কিসের শব্দ?

এই মানে ইয়ে, মানে কেউ কাঁদছে—

বৃষ্টি হাই তোলার ভান করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে বলল, বিড়াল টিড়াল হবে।

নানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাতি নিভিয়ে দিয়ে আবার ভয়ে ভয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। বৃষ্টি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার নলটিতে মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল এবং শুনতে পেল নানা চিৎকার করে দোয়াদরুদ পড়তে পড়তে লাফিয়ে ঘরের বাইরে এসে বসেছেন!

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বৃষ্টি আবিষ্কার করল নানা বারান্দায় একটা চেয়ারে গুটিসুটি

www.MurchOna.com

মেরে ঘুমিয়ে আছেন। রাত্রে তার নিজের ঘরে ঘুমানোর সাহস হয় নি। বৃষ্টি সাবধানে জানালা খুলে তার প্লাস্টিকের নলটি টেনে এনে পেঁচিয়ে ফেলে বিছানার নিচে লুকিয়ে ফেলল। দিনের বেলা সেটা কেউ দেখে ফেললে খুব বিপদ হয়ে যাবে।

নানা সারাদিন খুব মনমরা হয়ে রইলেন। রাত্রে যে ভয় পেয়েছেন সকালে সেটা কাউকে বলতে তার লজ্জা হল। আকারে-ইঙ্গিতে কয়েকবার মাকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলেন এই বাসায় কখনো ভূতের উপদ্রব হয়েছে কি না—মা হেসেই তার কথা উড়িয়ে দিলেন।

সেদিন বিকেলবেলা আকাশ কালো করে বৃষ্টি এল। বৃষ্টি ভেবেছিল তার নলটা আবার লাগাবে কিন্তু বাইরে যেতে সাহস পেল না। একটু আধটু ভিজতে তার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কেন ভিজেছে সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহা বিপদ হয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির দিনে ভয় দেখানোতে একটা অন্য রকম মজা রয়েছে। কিন্তু নলটা লাগানো হয় নি বলে এখন আর কিছু করার নেই।

নানা অবশ্যি আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন। বৃষ্টি গিয়ে দেখে এসেছে মৃদু এবং অত্যন্ত বিচিত্র স্বরে তার নাক ডাকছে। জানালাগুলো সব বন্ধ করা হয় নি এবং ভিতরে একটু একটু বৃষ্টির ছাট আসছে—সেটা দেখে হঠাৎ করে বৃষ্টির মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে খাবার ঘরে ফ্রিজ খুলে একটা বরফের টুকরা নিয়ে এসে নানার মশারির উপরে রেখে দিল। কিছুক্ষণেই সেটা গলতে শুরু করে টপ টপ করে মুখের ওপর পানি পড়তে শুরু করবে।

বৃষ্টি নিজের ঘরে বসে শুনতে পেল হঠাৎ করে নানার নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গালিগালাজ করছেন। বৃষ্টি তারপর জানালা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল এবং বুঝতে পারল গজগজ করতে করতে নানা আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। বৃষ্টি কান পেতে রইল এবং শুনতে পেল কিছুক্ষণের মাঝেই নানা আবার বিছানা থেকে উঠেছেন এবং পুরো খাট টেনে সরানোর চেষ্টা করছেন।

পরবর্তী দশ থেকে পনের মিনিট নানা তার বিছানা টানাটানি করলেন এবং একসময়ে আম্মা উঠে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে বাবা?

নানা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, তোদের বাড়ির ছাদে ফুটো, বৃষ্টির পানিতে ঘর ভেসে যাচ্ছে।

আম্মা অবাক হয়ে বললেন, কী বলছেন আপনি? ছাদে কেন ফুটো হবে। নূতন বিল্ডিং—

নানা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, নূতন বিল্ডিং শেখাচ্ছিস আমাকে? এই দেখ বালিশ ভিজে কী হয়েছে।

আম্মা ভেজা বালিশ দেখে খুব অবাক হলেন। ততক্ষণে আব্বাও উঠে এসেছেন। ছাদ ভালো করে পরীক্ষা করা হল। কোথাও কোনো ফাটল বা পানির চিহ্ন নেই। বরফটা এতক্ষণে গলে শেষ হয়েছে তাই পানি আর পড়ছে না। আব্বা বললেন, বাইরে তো এখনো বৃষ্টি পড়ছে। আমরা তো কোনো পানি দেখছি না—

নানা আবার মুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। তারপর কাঁপা গলায় বললেন, সর্বনাশ!

আম্মা বললেন, কী হয়েছে?

www.MurchOna.com
suman_ahmm@yahoo.com

কাল রাতের তারা নিশ্চয়ই এসেছে! পেশাব করে গেছে।

পেশাব? কারা পেশাব করেছে?

নানা বিড়বিড় করে দোয়া পড়তে পড়তে চিঁ চিঁ করে বললেন, রাত্রে এদের নাম নেয়া ঠিক না! এই বাড়িটার কিছু একটা দোষ আছে।

আব্বা এবং আম্মা নানার কথা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই ভুল করে পানি খেতে গিয়ে পানি ফেলেছেন—

নানা প্রতিবাদ করতে গিয়ে করলেন না। শুকনো মুখে একটা চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে রইলেন।

পরদিন বৃষ্টি স্কুল থেকে ফিরে এল মুখে একটা ঝলমলে হাসি নিয়ে। সাগরকে ঘরে ডেকে নিয়ে বলল, রাতে মজা দেখবি।

কী মজা আপু?

বৃষ্টি স্কুলব্যাগ থেকে একটা ছোট বোতল বের করে বলল, এই দ্যাখ।

এটা কী?

এর নাম এমোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড! গন্ধ শুঁকলে মাথা ফেটে যায়! রাত্রে নানার ঘরে একটা ডোজ দেব!

কেমন করে দেবে?

সময় হলেই দেখবি!

শুনে সাগরও একগাল হেসে ফেলল খুশিতে।

ঠিক সন্ধেবেলা বৃষ্টি আবার প্লাস্টিকের নলটা লাগিয়ে নিল। রাত্রিবেলা সবাই যখন শুয়েছে তখন বৃষ্টি নলটাতে শিশি থেকে এমোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইডটা ঢেলে দেয়। গড়িয়ে গড়িয়ে সেটা নানার ঘরে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে বলে সে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। বড় একটা বেলুন ফুলিয়ে নলটার মাঝে লাগিয়ে নেয়। বেলুনের বাতাস তখন ঠেলে ঠেলে ঝাঁঝালো গন্ধের এমোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড নানার ঘরে পাচার করতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই নানা তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠেন এবং শব্দ শুনেই বৃষ্টি তার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতে থাকে।

নানা হাজির হলেন কিছুক্ষণের মাঝে। কাঁপা গলায় ডাকলেন, গু-গু-গুলবদন।

বৃষ্টি কোনো শব্দ করল না। নানা তখন ডাকল, বিষ্টি—

বৃষ্টি ঘুম থেকে ওঠার ভান করে বলল, কী হয়েছে নানা?

তো-তোর মাকে একটু ডেকে আনবি?

কেন নানা?

আ-আ-আমার ঘরে শুধু পেশাবের গন্ধ!

পেশাবের গন্ধ? কে পেশাব করেছে?

জানি না—তোর মাকে ডাক দেখি—

বৃষ্টি আম্মাকে আর আব্বাকে ডেকে আনল। তারা নানার ঘরে এসেই নাক কুঁচকে দাঁড়ালেন। সারা ঘরে সত্যিই এমোনিয়ার একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। যারা গন্ধটা চেনে না তাদের কাছে পেশাবের গন্ধ মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আব্বা চিন্তিত মুখে নানার দিকে

তাকালেন। বললেন, আপনার ব্লাডার ঠিক আছে তো?

নানা চোখ পাকিয়ে বললেন, কী বলছ বাবাজী?

আব্বা ইতস্তত করে বললেন, সত্যিই এই ঘরে পেশাবের গন্ধ। আপনি ছাড়া তো আর কেউ থাকে না এই ঘরে। কাজেই বলছিলাম—

কী বলছিলে?

না, মানে, মানুষের যখন বয়স হয়ে যায় তখন নিজের শরীরের ওপরে কন্ট্রোল থাকে না। অনেক সময় ব্লাডার ফাংশান—

নানা বিস্ফারিত চোখে আব্বার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আব্বা বললেন, কাল আপনাকে একজন স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাব—

নানা থমথমে মুখে বললেন, চিকিৎসা আমার লাগবে না। চিকিৎসা লাগবে এই ঘরের। এই ঘরে দোষ আছে। আমি জানি—

আব্বা কিছু বললেন না। ছোট বাচ্চারা অর্থহীন কথা বললে বড়রা যেভাবে মাথা নাড়ে সেভাবে মাথা নাড়লেন।

নানা সারারাত তার ঘরে লাইট জ্বালিয়ে বসে রইলেন।

পরদিন নানার মেজাজ হল খুব তিরিক্ষে। সকালে এমনি এমনি সাগরকে খুব খারাপভাবে গালিগালাজ করলেন। বৃষ্টিকে দেখেই তার মেজাজ খারাপ হতে লাগল এবং আজকালকার মেয়েরা যে কী রকম বেপরদা এবং বেহায়া সেটা নিয়ে বিশাল একটা লেকচার দিলেন। দুপুরের দিকে কোনো কারণ ছাড়াই কাজের ছেলেটার কান ধরে এত জোরে একটা চড় মারলেন যে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল। সেটা দেখে আম্মাও একটু রেগে গিয়ে বললেন, বাবা, আমরা এই বাসায় কারো গায়ে হাত তুলি না।

নানা তখন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—আমাকে শেখাচ্ছিস কার সাথে কী করতে হবে? ছোটলোকের জাতকে যে আমি জুতো দিয়ে পিটিয়ে তাদের পিঠের চামড়া তুলে ফেলি নি সেটা তাদের বাপের ভাগ্য—

মানুষ যে এ রকম অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে পারে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না। বৃষ্টি নিজের ঘরে এসে সাগরকে বলল, আর সহ্য করা যায় না।

কী করবে আপু?

ফাইনাল ভয় দেখাব আজকে।

কীভাবে?

দুটো মুখোশ কিনে এনেছি। মুখে লাগিয়ে যাব মাঝরাতে।

সত্যি?

হ্যাঁ, তুই থাকবি এক জানালায়। আমি এক জানালায়। তারপর যেই আমাদের দিকে তাকাবেন হাত নেড়ে একবার শব্দ করব, বারটা বেজে যাবে!

যদি ধরা পড়ে যাই?

ধরা পড়লে পড়ব। আর কিছু করার নেই। এই মানুষকে আর সহ্য করা যাবে না।

মাঝরাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন বৃষ্টি আর সাগর দুজনে দুটো মুখোশ পরে নিল। বাসার সামনে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছে। দিনের বেলা সেটাকে এমন কিছু

www.MurchOna.com

আহামরি মনে হয় নি। কিন্তু রাত্রিবেলা সেটাকে ভয়ংকর দেখাতে থাকে—একজন আরেকজনকে দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং সাগর হঠাৎ বৃষ্টিকে দেখে নিজের অজান্তেই একটা ছোট চিৎকার দিয়ে ফেলে। সাথে সাথে পাশের ঘর থেকে নানা গলা উঁচিয়ে বললেন, কী হয়েছে?

বৃষ্টি আর সাগর একেবারে সিটিয়ে গেল। কী করবে বুঝতে না পেরে দুজনে প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে ঢুকল। এখন ধরা পড়ে গেলে একেবারে ভয়ংকর বিপদ হয়ে যাবে।

নানা পাশের ঘর থেকে আবার বললেন, কী হল?

বৃষ্টি আর সাগর কিছু বলল না। শুনতে পেল নানা তাদের ঘরের দিকে ছুটে আসছেন। বৃষ্টি মুখোশটা খুলে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সে মুখ ঢেকে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

নানা এতক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ঘরের লাইট কোথায় থাকে এতদিনে জেনে গেছেন। এসে হাত দিয়ে লাইটটা জ্বালালেন এবং সাথে সাথে একেবারে জমে গেলেন। সাগর মুখোশ নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে সেটা মুখে লাগিয়েই বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। তাকে দেখাচ্ছে একটা সাক্ষাৎ শয়তানের বাচ্চার মতো। নানা হঠাৎ বিকট চিৎকার করে বৃষ্টির বিছানার দিকে ছুটে এলেন। ভয়ে আতঙ্কে কী করবেন বুঝতে না পেরে বৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে আবার সেই ভয়াবহ চিৎকার করে উঠলেন। বৃষ্টি ঘুরে তার দিকে তাকাল, তখনো তার মুখে লাগানো রয়েছে বীভৎস একটা মুখোশ। হিংস্র কুটিল একজোড়া চোখের নিচে থ্যাবড়া নাক এবং অসুস্থ হলুদ রঙের মুখ। বীভৎস একপাটি দাঁত লোলুপ মুখের দুপাশে বের হয়ে আছে!

নানা এবারে রক্ত শীতল করা একটা চিৎকার করে বৃষ্টিকে ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। দরজার চৌকাঠে তার পা বেঁধে গেল এবং তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং হঠাৎ করে তার সাড়াশব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

বৃষ্টি আর সাগর ধরে নিয়েছিল পুরো ব্যাপারটির কারণে তাদের কপালে বড় ধরনের দুঃখ রয়েছে। কিন্তু দেখা গেল ঘটনাটি একেবারে অন্যভাবে মোড় নিল। নানা জ্ঞান ফিরে পাবার পর থেকে বলতে লাগল বৃষ্টি আর সাগরকে জিনে পেয়েছে এবং তিনি নিজের চোখে দেখেছেন তাদের চেহারা পাল্টে পশুর মতো হয়ে গেছে। ডাক্তার কিংবা আব্বা-আম্মা কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না। তাদের ধারণা হল কিডনি ঠিক করে কাজ করছে না বলে শরীরে ইউরিয়া জমা হয়ে তার মানসিক বিভ্রান্তি হচ্ছে।

তাকে কয়েকদিন নার্সিং হোমে রাখা হল। তারপর তাকে আবার বাসায় আনার কথা ছিল, কিন্তু নানা রাজি হলেন না। নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন।

বৃষ্টি আর সাগরকে জিনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য নানা তার পীরের কাছ থেকে একজোড়া তাবিজ পাঠিয়েছেন। বিশাল তাবিজ দেখে মনে হয় ছোটখাটো একটা ড্রাম! বৃষ্টি তাবিজটি তুলে রেখেছে। নানা যদি আবার কোনোদিন আসেন গলায় ঝুলিয়ে তার সামনে হাঁটাহাঁটি করতে হবে! তারপর ওই তাবিজ দিয়েই তাকে দারুণ একটা ভয় দেখানো যাবে। বৃষ্টি এখন থেকেই তার খুঁটিনাটি ঠিক করতে শুরু করেছে।

www.MurchOna.com

ছবি

আমার একটি গরুবন্ধু আছে। ছেলেবেলা থেকে তাকে চিনি আমি। একসাথে বড় হয়েছি। কাজেই আমার তাকে 'গরু' ডাকার হক আছে। কানাকে কানা বলতে হয় না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে হয় না, কিন্তু গরুকে গরু বলতে তো কোনো দোষ নেই! সে বাস্তবিকই গরু। আমরা স্কুলে যখন বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, অভিযাত্রিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম তখন সে কীভাবে সুরকির ব্যবসা করে বড়লোক হবে তার স্বপ্ন দেখত। কলেজে পড়ার সময় আবিষ্কার করলাম মানুষকে খোশামোদি করায় তার কোনো তুলনা নেই। আমরা যখন কিছুতেই হোস্টেলে জায়গা পাচ্ছি না সে হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টকে খোশামোদি করে কীভাবে কীভাবে জানি একটা জায়গা করে নিল—পড়াশোনায় আমাদের থেকে ঢের খারাপ হয়েও। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে রাজনীতি করা শুরু করল। আশ্চর্য রকম রাজনীতি, যখন যে দল ক্ষমতায় তখন সে দল। কোথাও কোথাও নাকি সে মারামারিও করতে গেছে। সরকারি দলের মারামারি করার হক অন্যদের থেকে বেশি। আমি লিখে দিতে পারি সে নিজে কখনো কারো গায়ে হাত তোলে নি, বড় গুণ্ডাদের সাগরেদ হিসেবে পিছনে থেকে লাফঝাঁপ দিয়েছে। যাই হোক, কোনোমতে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রি নিয়ে নিল। তারপরেই সে তার সারা জীবনের স্বপ্নের পিছনে লেগে গেল—টাকা বানানো।

এতদিনে তার অনেক লোকজনের সাথে পরিচয় হয়েছে। খোশামোদি করে সবাইকে সে নরমও করে রেখেছে। তাদের ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যবসার পারমিট যোগাড় করে সে সত্যি সত্যি টাকা বানানো শুরু করল। প্রথমে দেখতাম রিকশা করে যাচ্ছে, কোলের উপর ব্রিফকেস। তারপরে স্কুটার, পাশে ব্রিফকেস। এরপর হঠাৎ গাড়ি। ব্রিফকেস আর বাইরে থেকে দেখা যায় না। ইদানীং তাকে একেকদিন একেকটা গাড়িতে দেখি। টাকা সত্যিই সে বানিয়েছে! আমার এই গরুবন্ধুটির একটিমাত্র গুণ—এত টাকা হবার পরেও সে আমাদের ভুলে যায় নি। ছেলেবেলায় আমরা যারা বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং অভিযাত্রিক হবার স্বপ্ন দেখতাম এবং বর্তমানে যারা কলেজের মাস্টারি, খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদক বা ব্যাংকের কেরানির কাজ করি তাদের সে নিয়মিত খোঁজ নেয়। রাস্তায় কখনো দেখা

www.MurchOna.com

হলে গাড়ি থামিয়ে এমন হইচই শুরু করে দেয় যে আশপাশে লোক জমা হয়ে যায়। তার বাসাতে প্রায় প্রত্যেকদিন কাউকে না কাউকে ডাকছে। কিন্তু যে একবার গিয়েছে সে সহজে দ্বিতীয়বার যেতে চায় না। কেন চাইবে? সে বাস্তবিকই গরু, তার সাথে কোনোকিছু নিয়ে কথা চালিয়ে যাওয়া যায় না। সে সারা জীবনে একটিমাত্র বই পড়েছে—নীহাররঞ্জন গুপ্তের কী একটা উপন্যাস। সে এখনো বিশ্বাস করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল প্রাইজ দেবার পেছনে হিন্দুদের কী একটা ষড়যন্ত্র আছে। তার মতে, আইয়ুব খানের মতো জাঁদরেল বাঘের বাচ্চা নাকি পৃথিবীতে আর জন্মায় নি। এর সাথে কী নিয়ে গল্প করব? একদিন সে আমার সাথে দুঃখ করে বলল, তার বাসায় কেউ এলে বেশিক্ষণ বসতে চায় না; সে এত যত্ন করে তবুও। আমি তাকে বলেই ফেললাম সত্যি কথাটা। বললাম, দ্যাখ, তোর সাথে লোকজন কী নিয়ে গল্প করবে? তুই এখনো বিশ্বাস করিস—আইয়ুব খানের মতো মানুষ হয় না। তুই—

সে ভারি অবাক হল, বলল, কেন তুই মানতে রাজি না?

আমি আর কী বলব, তবু ওকে বোঝালাম—তোর বাসায় এলে তুই ভালো গদিওয়ালা সোফায় বসতে দিস, ভালো ভালো খেতে দিস, তারপর তোর টাকার গল্প শুরু করিস, কার এত মাথাব্যথা পড়েছে যে বসে বসে তোর টাকার গল্প শুনবে? তোর ভ্যাজর ভ্যাজর শুনে বিরক্ত হয়ে যে মানুষ একটা বই খুলে দেখবে তার উপায় আছে? তোর বাসায় কোনো বই আছে?

বন্ধুটি মিনমিনে গলায় বলল, আমি কি ভ্যাজর ভ্যাজর করি?

দ্যাখ! তুই জানিস পর্যন্ত না যে তুই ভ্যাজর ভ্যাজর করিস।

আমার গরুবন্ধুটি একটু দুঃখ পেল দেখে আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তুই যদি সত্যি চাস বন্ধুবান্ধব এসে তোর বাসায় বসুক, গল্প করুক তাহলে তোর নিজের গল্প করা ছাড়। বাসায় কিছু বইপত্র কিনে রাখ, জোর করে হিন্দি গান শোনানো বন্ধ করে তাদের নিজেদের পছন্দ করা গান শুনতে দে। কয়টা রবীন্দ্রসঙ্গীত, কিছু বাংলা রেকর্ড কিনে আন। আর সবচেয়ে বড় কথা একা কাউকে না ডেকে একসাথে কয়েকজনকে ডেকে আন। তোর সাথে কথা বলে আরাম না পেলে নিজেরা নিজেরা কথা বলবে। তুই দেখবি লোকজন কী নিয়ে কথা বলে, দেখে শিখবি।

গরুবন্ধুটি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা লম্বা শ্বাস ফেলল, কিছু বলল না। আমার একটু খারাপই লাগছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে?

বন্ধুটি আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মানার চেষ্টা করল। সাধে কি আর গরু বলি! অন্য কেউ হলে কিছুতেই এত বড় অপবাদ চুপচাপ সহ্য করে আমার কথা মেনে নিত না। কিন্তু আমার কথা সত্যি কাজে দিল। একদিন বাসায় গিয়ে দেখি অনেক লোকজন হইচই করছে। দেয়ালে লম্বা টানা সেলফ, হাজার হাজার বই, দেয়ালে সুন্দর সুন্দর পেইন্টিং, পাশে রেকর্ডপ্লেয়ারে মিষ্টি সেতার বাজছে। দেখে আমার ভালোই লাগল। বন্ধুটি কাছে এসে চোখ মটকে বলল, তুই বলছিলি আমি নাকি কথা বলতে জানি না, আমার বাসায় লোকজন আসে না। তাকিয়ে দ্যাখ!

সত্যি দেখার মতো, অনেক মজার মজার মানুষ এসেছে। একপাশে দুজন দাবা

খেলছে, অন্যপাশে তাস। এক কোনায় ভূতের গল্প অন্য কোনায় প্রচণ্ড রাজনীতি। গরুবন্ধুটি তার মাঝে মুখে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক কোনায় একজন লোক খুব মনোযোগ দিয়ে দেয়ালে একটা পেইন্টিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। ছবিটি দেখে আমিও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এত সুন্দর জলরঙের ছবি আমি কম দেখেছি। একটা মেয়ের মুখ। বড় বড় কালো চোখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছে। যেন এক্ষুনি লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেবে। গরুবন্ধুটির এত ভালো রুচি জানতাম না। গিয়ে ছবিটির কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, হ্যাঁ ওটা সস্তায় দিল না, তবু নিয়ে নিলাম।

তুই নিজে পছন্দ করেছিস?

হ্যাঁ, এটার ফ্রেমটা ছোট আছে, ওই জায়গার জন্যে একেবারে মাপসই।

আমি কি আর শুধু শুধু ওকে গরু বলি? ফ্রেমের মাপ দেখে কিনে এনেছে। ছবিটা যে সুন্দর সে জানে পর্যন্ত না।

এরপর মাঝে মাঝে ওর বাসায় গিয়েছি, একবার দুবার গিয়েছি শুধু ছবিটা দেখার লোভে। ছবিটা আমাকে এত মুগ্ধ করেছে যে বলার মতো নয়। ওর বাসায় এই ছবি মানায় না। ওই ফ্রেমের অন্য একটা ছবি ওকে দিয়ে এই ছবিটা আমি নিয়ে নেব একদিন। ওর কী আসে যায়?

একদিন রাস্তায় বন্ধুটির সাথে দেখা। আমাকে অভ্যাসমতো জোর করে ধরে বাসায় নিয়ে গেল। বাসায় ঢুকে আমি প্রথমেই ছবিটা দেখতে গেলাম। কাছে গিয়ে আমি আঁতকে উঠি। সেই ছবিটা নেই, ছবিটার মতো দেখতে আরেকটা ছবি ঝুলছে। বেশ কাঁচা হাতের কাজ, ছবিটাকে নকল করার চেষ্টা করেছে, খানিকটা পেরেছেও, কিন্তু ছবির সৌন্দর্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। আমি চিৎকার করে ডেকে বন্ধুটিকে বললাম, তোর ছবিটি কোথায়?

সে অবাক হয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, এই তো।

গরু কোথাকার! দেখছিস না এটা অন্য ছবি?

তাই নাকি? সে কাছে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলল, কোথায়, আমার তো ওই রকমই লাগছে! হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল। সত্যিই তো! আগেরটার ফ্রেম অনেক ভালো কাঠের ছিল, এটা সস্তা কাঠ!

আমি বললাম, যে চুরি করেছে ঠিকই করেছে। তোর বাসায় এই ছবি মানায় না। একটা ভালো ফ্রেমে একটা সিনেমার পোস্টার ঝুলিয়ে রাখিস।

বন্ধুটি আমার গালিটা চুপচাপ হজম করে বলল, ছবিটা কে নিয়েছে বলতে পারিস?

আমি কীভাবে বলব?

কীভাবে বের করি বল তো?

বের করে কী করবি? যে নিয়েছে সে ছবিটা পছন্দ করে বলে নিয়েছে। আমি না বললে তুই কোনোদিন জানতে পর্যন্ত পারতি না যে ছবিটা নেই। যেটা আছে সেটা নিয়েই খুশি থাক।

বন্ধুটি কিন্তু খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার ছবিটার জন্যে। আমাকে নানাভাবে বোঝাতে লাগল ছবিটা যে তার কত প্রিয় ছিল ইত্যাদি! আমাকে জিজ্ঞেস করল কোনোভাবে বের করে দিতে পারি কি না কে নিয়েছে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর বন্ধুদের কেউ ছবি আঁকতে পারে?

www.MurchOna.com

সে বলল জানে না। জানতাম জানবে না। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত কিছুতেই তার উৎসাহ নেই। ছবিটা আঁকতে হয়েছে, কাঁচা হাতের কাজ। তাই মনে হয় না কোনো পেশাদার শিল্পীকে দিয়ে করা। যে চুরি করেছে খুব সম্ভবত সেই এঁকেছে। কাজেই তার বন্ধুদের কেউ যদি ছবি আঁকতে পারে এবং মোটামুটি ভালোই পারে তাহলে তাকে দিয়ে শুরু করা যেত। ছবিটা আঁকার জন্যে একটা ফটো নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি কখনো তোর ছবিটার ফটো তুলেছে?

বন্ধুটি মাথা চুলকে বলল, তুলেছে, কিন্তু কে তুলেছে তার মনে নেই। আমি সন্দেহ করেছিলাম তার মনে থাকবে না। তাকে খামাখা আমি গরু ডাকি না। বন্ধুটি বলল, আগামীকাল তার বাসায় অনেককে রাতে খেতে বলেছে, তখন সে তাদের জিজ্ঞেস করবে কেউ ছবি আঁকতে পারে কি না। আমি বললাম, খবরদার ওরকম কাজ করিস না। যে ছবিটা চুরি করেছে সে ভুলেও স্বীকার করবে না, বরং আরো সাবধান হয়ে যাবে। জিনিসটা কায়দা করে বের করতে হবে। কাল আমিও আসব, দেখি কী করা যায়। খবরদার কাউকে বলবি না যে তুই জেনে গেছিস যে এটা আসল ছবি না। বন্ধুটি রাজি হল।

ওর বাসা থেকে বের হয়ে আমি আমার এক চাকমা বন্ধুর কাছে গেলাম। ছেলেবেলায় বান্দরবানে দুজন এক স্কুলে পড়েছি। সে এখন ডাক্তারি পাস করে ডাক্তার হয়েছে। থাকে চাটগাঁ, কী কাজে ঢাকা এসেছে, আবার চলে যাবে। আমাকে দেখে সে ভারি খুশি হল। গল্প শুরু করার আগেই বলে নিলাম আমি তার কাছে শুধু গল্প করার জন্যেই আসি নি, তাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।

সে জিজ্ঞেস করল, কী কাজ?

তোকে তো এমনিতেই চাকমা চাকমা দেখায়, তোকে ভান করতে হবে যে তুই জাপানি। জাপানি ভাষা ছাড়া একেবারেই অন্য কোনো ভাষা জানিস না।

তার ছোট ছোট চোখ কৌতূহলে যতটুকু সম্ভব বড় বড় হয়ে উঠল। কেন? কেন? তুই এখন আবার কার পিছনে লেগেছিস?

কারো পিছনে লাগি নি, একটা চোর ধরতে হবে। আমি তাকে পুরো ব্যাপারটি খুলে আমার পরিকল্পনাটি জানালাম। শুনে সে মহা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় দুজনে একসাথে অনেক বাঁদরামো করেছি। এই বয়সে আরেকবার সুযোগ পেলে ছেড়ে দেয় কীভাবে? সে আমাকে কথা দিল যে সে এমন চমৎকার অভিনয় করবে যে কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করবে না।

পরদিন সন্ধেবেলা তাকে নিয়ে একটু দেরি করে আমার বন্ধুর বাসায় গেলাম। সবাই ততক্ষণে এসে গেছে। আমি বন্ধুটিকে বললাম, আমাদের অফিসে জাপান থেকে একজন এসেছে, কাল ওকে একটু ঢাকা শহর ঘুরিয়ে দেখাতে চাই, সে তার একটা গাড়ি দিতে পারবে কি না। এটা নূতন কিছু নয়, যে কোনো দরকারে আমরা সবাই ওর গাড়ি ব্যবহার করি। এতগুলো গাড়ি, সে খুব খুশি হয়েই রাজি হয়।

আমি সবার সাথে জাপানি বন্ধু 'ইকিমাতার' পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলাম। সে একটা–দুইটা ইংরেজি শব্দ ছাড়া আর কিছু জানে না। তাই শুধু মাথা নাড়ানাড়ি আর দাঁত বের করে হাসি হাসি মুখ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করা গেল না। কেউ আমাদের ভাষা জানে না জানলে আমরা তার সামনেই নিজের ভাষায় তাকে তুলোধুনো করে থাকি,

www.MurchOna.com

এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। জাপানির কেমন খাদা নাক, কুতকুতে চোখ এবং কেমন বেকুবের মতো চেহারা সেটা নিয়ে কয়েকজন তার সামনেই হাসাহাসি করল। আমার চাকমা বন্ধু ভালো অভিনেতা। একটুও না চটে উঠে হাসি হাসি মুখ করে অপ্রস্তুত বিদেশি সেজে বসে থাকল।

আমার গরুবন্ধুটি আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হল তুই বের করবি না কে ছবি আঁকতে পারে?

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, আজ হবে না রে, দেখছিস না জাপানি নিয়ে ফেঁসে গেছি। আজ চলে যেতে হবে।

বন্ধুটির একটু আশাভঙ্গ হল। বলল ঠিক আছে আরেকদিন হবে। তোরা খেয়ে যা।

আমি একটু ইতস্তত করে রাজি হলাম। জাপানিকে নিয়ে খেতে বসে মহা মুশকিল। কিছুই প্লেটে নিতে চায় না। জাপানি ভাষায় কী কী বলে আর মাথা নেড়ে না করে। মাঝে মাঝে গোশতটা দেখিয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করে, হাতপা নেড়ে কী যেন দেখায়। আমি চমৎকৃত হয়ে দেখছিলাম, দেখে কে বলবে এ খাঁটি জাপানি ছাড়া আর কিছু।

একজন বলল, জানতে চাইছে এটা কী।

আমি বললাম, এটা গরু। বিফ-বিফ।

আরেকজন গলার স্বর আরো উঁচু করল, কাউ, কাউ মিট। যেন চেঁচিয়ে কথা বললেই ভাষার দেয়াল ভেঙে পড়ে।

গরুবন্ধুটি নেচে-কুঁদে মাথায় শিং, পিছনে ল্যাজ দেখিয়ে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো লাভ হল না। উল্টো জাপানি একটু ভয় পেয়ে মুখ ফ্যাকাসে করে চুপ হয়ে গেল।

একজন বলল, আমি তো জানতাম এরা সাপ ব্যাঙ সব খায়, এই শালার এত ঢং কেন?

একজন বলল, ব্যাটাকে চিৎ করে শুইয়ে, মুখ হাঁ করে দেও তরকারিটা ঢেলে!

আরেকজন বলল, আহা বেচারা, খেতে পারছে না, কী না কী সন্দেহ করছে, দেও না বুঝিয়ে কোনটা কী।

গরুবন্ধুটির বুদ্ধিও গরুর মতো, বলল, একটা গরু ধরে আনতে পারলে হত।

তখন একজন বলল, ছবি একে বুঝিয়ে দিলে হয়।

আমি ঠিক এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। কথাটা লুফে নিয়ে বললাম, ঠিক বলেছেন। কাগজ-কলম বের করে গোশতের বাটিটা দেখিয়ে গরু আঁকার চেষ্টা করতে লাগলাম। শিং এবং ল্যাজ দেবার পরেও ছবিটি কিছুতেই ফুটে উঠল না। অদ্ভুত একটা জন্তুর মতো দেখাতে লাগল। জাপানি খানিকক্ষণ ছবিটা দেখে গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল—সে বুঝতে পেরেছে এটা কিসের গোশত। সে কী বুঝেছে সেটাও সে বুঝিয়ে দিল বার দুয়েক ঘেউ ঘেউ করে কুকুরের মতো ডেকে। ভুল বলে নি সে, ছবিটি গরুরও হতে পারে কুকুরেরও হতে পারে। হাতি কিংবা কুমিরও হতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী যে কোনো চতুষ্পদ প্রাণীর হতে পারে!

একজন এতক্ষণ উসখুস করছিলেন, এবারে বললেন, আমাকে দিন দেখি কাগজটা। তাকে কাগজটা দেয়া হল। তিনি কলমের দুইটানে একটা গরু এঁকে ফেললেন, কী

www.MurchOna.com

চমৎকার গরু, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি দেখে জাপানি এবার সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, মিকা! মিকা!! মিকা ইট মিকা ইট! আমরা সবাই বুঝলাম মিকা মানে গরু এবং সে গরু খায়। চাকমা বন্ধুটি তার ইচ্ছামতো জাপানি শব্দ আবিষ্কার করছে!

আমি ভদ্রলোককে বললাম, আপনি তো ভালো ছবি আঁকেন! তিনি বিব্রত ভাবে একটু হেসে বললেন, এই আর কী!

আমার মনে পড়ল একেই আমি প্রথমবার দেখেছিলাম দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতে। ভদ্রলোক চুপচাপ মানুষ, শখের লেখক। এমনিতে কী এক বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করেন, বিয়েথা করেন নি, একা একা থাকেন। সম্ভবত ইনিই ছবিটা নিয়েছেন।

গরুবন্ধুটি আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বলল, দেখলি, তোর আর বের করতে হল না কে ছবি আঁকতে পারে। এমনিতেই বের হয়ে গেল! তোর এই জাপানি শালাকে দিয়ে খুব লাভ হল তো!

জাপানি শালা কাছাকাছি ছিল, এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে গরুবন্ধুটিকে ফিসফিস করে বলল, দেখেন আমি জাপানি শালা না, আমি খুব ভালো বাংলা জানি।

শুনে আমার বন্ধুর চোয়াল ঝুলে পড়ল, বুক চেপে ধরে খাবি খেতে খেতে সে কোনোমতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। তার অবস্থা দেখে আমি আর কিছুতেই হাসি আটকে রাখতে পারি না, কিন্তু আমার চাকমা বন্ধুটি নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে! আমার অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে তাড়াতাড়ি সবার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। শেষ মুহূর্তে আমার গরুবন্ধুটি কোনোমতে একটু ধাতস্থ হয়ে ছুটে এসে আমাদেরকে গেটের বাইরে এসে ধরল। চাকমা বন্ধুটির হাত ধরে বলল, ভাই, মাফ করে দেবেন আমাকে। বাংলা জানেন না ভেবে কত কী বাজে কথা বলেছি! চাকমা বন্ধুটি হাসিমুখে বলল, সে কিছু মনে করে নি, পুরোটাই সে একটা মজা হিসেবে নিয়েছে। সত্যি তাই। বাসার বাইরে এসে তার ছোট ছোট চোখগুলো আরো ছোট করে সেই যে হাসা শুরু করেছে আর থামার নাম নেই!

পরদিন গরুবন্ধুটির সাথে আমার সেই ভদ্রলোকের বাসায় যাবার কথা। তাকে কিছু বলা হবে না, সত্যি যদি ছবিটি পাওয়া যায় সুযোগমতো সেই ছবিটি তার নিজের আঁকা ছবি দিয়ে পাল্টে দেয়া হবে। ছবিটা সত্যিই যদি তার বাসায় থাকে আমি আশা করে আছি সেটি খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে না। ছবিটা যখন তার এত পছন্দ, নিশ্চয়ই সেটি সব সময়েই দেখেন, তাই লুকোনো থাকলেও আশপাশেই থাকবে।

আমাদের দেখে ভদ্রলোক কেমন জানি ভেবাচেকা খেয়ে গেলেন। বললেন, একটু দাঁড়ান, তারপর ভেতরে ঢুকে কী একটা করে এক মুহূর্ত পরেই আবার বেরিয়ে এসে বললেন, আসুন ভেতরে আসুন। আমি তখন নিঃসন্দেহ হলাম যে ছবিটা সত্যিই তিনি নিয়েছেন, ভেতরে ঢুকে তিনি চট করে লুকিয়ে ফেলেছেন। আমার গরুবন্ধুটি আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল।

ভদ্রলোকের বাসায় ঢুকে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল, এত সুন্দর করে সাজানো ঘর আমি আগে দেখি নি। ঘরের দেয়ালে চমৎকার সব জলরং তেলরঙের ছবি। চারদিকে

www.MurchOna.com

দেশি-বিদেশি, ছোটবড় নানা ধরনের মূর্তি, সেলফ বোঝাই অসংখ্য বই। ভদ্রলোক রুচিশীল এক নজরেই সেটা বোঝা যায়। আমার হঠাৎ করে মনে হল ছবিটি আসলে এঁর বাসাতেই মানায়, গরুবন্ধুটির কাছ থেকে নিয়ে তিনি ঠিক কাজই করেছেন! একবার মনে হল ছবিটা বের করার চেষ্টা না করে ফিরে যাই। কিন্তু এতকিছু করে এখন ব্যাপারটি শেষ না করার মানে হয় না। আমি তাই রুমাল বের করে একবার নাক ঝাড়লাম, এটা একটা ইঙ্গিত, এটা করলে আমার গরুবন্ধুটির ভদ্রলোককে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে, বাথরুমে যাবে বলে। আমার বেশ কয়েকবার নাক ঝাড়তে হল। কারণ, গরুবন্ধুটি ভাবছিল আমার বুঝি ঠাণ্ডা লেগেছে আর আমি সত্যি সত্যি নাক ঝাড়ছি! যাই হোক শেষ পর্যন্ত সে যখন বুঝতে পারল এটা সেই ইঙ্গিত, লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সে বাথরুমে যাবে, একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দিতে হবে। অত্যন্ত কাঁচা অভিনয়। যে কেউ দেখে বুঝতে পারবে এটি অতি-অভিনয়। হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কী আর করা যাবে? তাকে বেশ খানিকক্ষণ আটকে রাখার জন্য কয়েকটা কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিলাম। যেমন, তার বুকপকেটে খুচরা পয়সা থাকবে, উবু হয়ে খুলে যাওয়া জুতোর ফিতে বাঁধার সময় ঝন ঝন করে পয়সাগুলো মেঝেতে পড়ে যাবে। দুজনে মিলে পয়সা কুড়ানোর সময় সে বলবে পকেটে একটা আংটিও ছিল। দুজনে মিলে তখন তন্নতন্ন করে আংটিটা খুঁজতে থাকবে। সেটি পাবে না। কারণ আংটিটা তার প্যান্টের পকেটে। আমি যখন ভেতর থেকে একবার কেশে উঠব সে হাফপ্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আংটিটা পেয়ে যাবে। তখন দুজনে মিলে ফিরে আসবে।

ওরা বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই আমি উঠে দেয়ালের ছবিগুলো লক্ষ্য করতে থাকি। যে ছবিটার ফ্রেম চুরি যাওয়া ছবিটার মতো বড় সেটার কাছে গিয়ে একটু লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম ওখানে আসলে দুটো ফ্রেম, একটার উপরে আরেকটা একটা উল্টানো সেটার উপরে অন্যটা সোজা। এমনভাবে রাখা হয়েছে ভালো করে লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না এখানে দুটি ফ্রেম। চমৎকার বুদ্ধি! আমি নিচেরটা না দেখেই বুঝতে পারি এই সেই ছবিটা। সত্যি তাই। ছবিটা নামিয়ে এক দৌড়ে গাড়িতে রেখে আসার সময় আরো একবার মনে হল কাজ নেই ছবিটা নেয়ার, গরুবন্ধুটির কাছে এই ছবির কী মূল্য আছে? কিন্তু ব্যাপারটি যে বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছি সেটা ভদ্রলোককে না জানালেও ঠিক তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই ছবিটা রেখে ভদ্রলোকের আঁকা ছবিটা নিয়ে এসে সেটা নিচে রেখে আবার আগের মতো করে রেখে দিলাম। সব মিলিয়ে এক মিনিটও লাগল না। আমরা চলে যাবার পর ভদ্রলোক যখন ছবিটা উল্টাবেন তখন তার মুখের অবস্থা কী হবে খুব দেখার ইচ্ছা হচ্ছিল।

আমি সোফাতে বসে আগের পরিকল্পনামতো একবার কাশলাম। আমার গরুবন্ধুটি আমার কাশি শুনেও সে তার আংটি খুঁজতে থাকে, এত তাড়াতাড়ি যে হয়ে যেতে পারে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বসে থেকে বিরক্ত হয়ে বাধ্য হয়ে আমিও ভেতরে গিয়ে আংটি খোঁজায় যোগ দিলাম। একটু পরে বললাম, তোর প্যান্টের পকেটে নেই তো, হয়তো ওখানেই আছে। সে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সেটা পেয়ে গিয়ে আবার খুশি হওয়ার একটা অতি-অভিনয় করল।

আমরা বেশ খানিকক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে চলে এলাম। ভদ্রলোক চমৎকার মানুষ, তাকে এ রকম একটা খোঁচা দিতে আমার খারাপই লাগছিল, কিন্তু কী আর করা যাবে! বের হয়েই বন্ধুটি জিজ্ঞেস করল, পেয়েছিস?

www.MurchOna.com

আমি মাথা নাড়তেই আমার পিঠে প্রচণ্ড থাবা মেরে বলল, শাব্বাশ! তোর আসলে পুলিশে যাওয়া উচিত ছিল, বড় সিআইডি হতে পারতি।

এই জন্যে তাকে আমি গরু বলি, অন্য যে কেউ হলে আমাকে শার্লক হোমস বা নিদেনপক্ষে পেরী মেসনের সাথে তুলনা করত, কিন্তু এ পুলিশের বাইরে কিছু জানলে তো!

আমি বললাম, তোর ছবিটা বের করে দিলাম, আমাকে কী দিবি?

কী চাস?

তোর ছবিটা এক সপ্তাহ আমাকে রাখতে দিবি?

এক সপ্তাহ মোটে? তুই এক মাস রাখ। তোকে আমি ছবিটা দিয়েই দিতাম, কিন্তু কেমন জানি ছবিটার উপর মায়া পড়ে গেছে! ছবিতে মেয়েটার চোখগুলো দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়!

পরিষ্কার একটা মিথ্যা কথা বলল, ও ছবির কিছু বোঝে না। আমি কিছু মনে করলাম না, শিল্পের সমঝদারের ভান তো সবাই করে, এ আর নূতন কী?

ছবিটা এক মাস আমার বাসায় থাকল। এক মাস পরে গরুবন্ধুটি এসে ছবিটা নিয়ে গেল। আমি তাকে বললাম ছবিটা টাঙানোর পর প্রথম যেদিন সেই ভদ্রলোক তার বাসায় আসবেন আমাকে যেন জানানো হয়, আমি দেখতে চাই তিনি কী করেন।

খবর পেয়ে একদিন আমি তার বাসায় গেলাম। যথাসময়ে সেই ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন, মনে হল ব্যাপারটি খুব সহজভাবেই নিয়েছেন। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই না নিয়ে উপায় কী? ঘরে ঢুকে মামুলি কথাবার্তা বলে হেঁটে হেঁটে ছবিটার কাছে গেলেন। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একটু চমকে উঠলেন। তার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। আস্তে আস্তে তিনি ঘুরে তাকালেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আস্তে বাম চোখটা একটু মটকালাম। ভদ্রলোকের মুখে খুব ধীরে ধীরে একটা হাসি ফুটে ওঠে, আস্তে আস্তে তার হাসি আরো বিস্তৃত হয়। সোফাতে বসে তিনি হাসতেই থাকেন, হাসতেই থাকেন।

আমিও হাসতে থাকি, কারণ শুধু আমিই জানি তিনি কেন হাসছেন। এটা আসল ছবিটা নয়, আমি একজনকে দিয়ে নকল করিয়ে গরুবন্ধুটিকে নকল ছবিটা ফেরত দিয়েছি। তবে ফ্রেমটা আসল ফ্রেম, তাতে কোনো ভুল নেই।

আসল ছবিটা আমার কাছে আছে, ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দেব বলে রেখেছি। কয়দিন যাক তখন গরুবন্ধুকে সব খুলে বলতে হবে। যদি আবার সেই ছবির জন্যে হইচই শুরু করে পুরো ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে শুরু করা যাবে! বেচারাকে বলে না দিলে সে বলতে পর্যন্ত পারে না কোনটা আসল ছবি!

সাধে কি আর আমি তাকে গরু বলি?

www.MurchOna.com

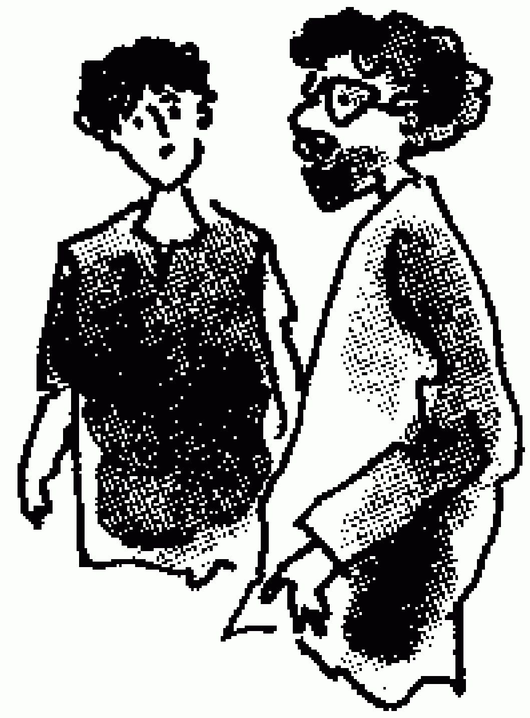

ছক্কা

টুটুলকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে সে আসলে একজন খাঁটি বিজ্ঞানী। তার বয়স দশ, দশ বছর বয়সে কেউ পুরোপুরি বিজ্ঞানী হতে পারে না, সে কারণে সেও পুরোপুরি বিজ্ঞানী হতে পারে নি। কিন্তু যেটুকু হয়েছে সেটা একেবারে খাঁটি—তার মাঝে কোনো ভেজাল নেই। বিজ্ঞানীদের যেরকম বড় বড় চশমা থাকে, মাথায় এলোমেলো চুল থাকে, ময়লা অগোছালো কাপড় থাকে টুটুলের সেগুলো কিছু নেই। তার চোখ খুব ভালো, ক্লাসে একেবারে পিছনের বেঞ্চে বসে ব্ল্যাকবোর্ড পড়তে পারে, মাথায় চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে রাখে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরে। শুধু তাই না, বিজ্ঞানীদের মতো তার হালকাপাতলা দুর্বল শরীর নয়। তার পেটা শরীর—টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলার সময় প্রতিদিনই সে দুই-তিনটা বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দেয়। বিজ্ঞানীদের মতো সে ঘরকুনো নয়—প্রতিদিন বিকালে সে হইচই করে দৌড়াদৌড়ি করে খেলে।

কিন্তু তবু যে সে বিজ্ঞানী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার ড্রয়ার বোঝাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—নানাভাবে সে যোগাড় করেছে। চশমার কাচ, পুরোনো রেডিও থেকে বের করা ক্যাপাসিটর, কয়েল, রেজিস্টার, টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা থার্মোমিটার, মোটর খুলে নেয়া চুম্বক, ব্যাটারি, ইলেকট্রিক তার—এমন কিছু নেই যেটা সেখানে পাওয়া যাবে না। এই সব জিনিস আছে বলেই যে সে বিজ্ঞানী তা নয়, অনেক বাচ্চার ড্রয়ার খুললেই এ রকম জিনিস পাওয়া যায়। সে বিজ্ঞানী, কারণ সে এইসব জিনিস জুড়ে দিয়ে বিচিত্র সব নূতন জিনিস তৈরি করে। অনেক বাচ্চাই হয়তো বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে এ রকম তৈরি করতে পারে, কিন্তু তাদের সাথে টুটুলের একটা পার্থক্য রয়েছে, সে শুধু চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো জুড়ে দেয় না—কেন কয়েকটা ছোটখাটো সাধারণ জিনিস জুড়ে দিলে সেটা অন্য একটা অসাধারণ জিনিস হয়ে যায় ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারটাও তাকে খাঁটি বিজ্ঞানী করে নি, তাকে খাঁটি বিজ্ঞানী করেছে সম্পূর্ণ অন্য একটা জিনিস। সে বিজ্ঞানীদের মতো চিন্তা করে।

www.MurchOna.com

যেমন—যখন তার বড় ফুফুর পর পর দুইটা মেয়ে হল তখন মেজো চাচি বললেন, আজকাল সবার শুধু মেয়ে হচ্ছে।

টুটুলের আম্মা মাথা নেড়ে বললেন, ঠিকই বলেছ ভাবী, মনে নেই আমাদের শিউলির মেয়ে হল?

হ্যাঁ, কাজলের হল। লীনার হল।

তখন অন্য সবাই মাথা নেড়ে বলতে লাগল, চারদিকে শুধু মেয়ে আর মেয়ে। পৃথিবীতে এখন মেয়ের জন্ম হচ্ছে বেশি।

টুটুলের পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হল না। সে বলল, পৃথিবীতে পাঁচ শ কোটি মানুষ। মাত্র পাঁচ–ছয় জনকে দেখে সেটা সম্পর্কে কোনো কথা বলা ঠিক না।

ছোট চাচা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন বলে তার ধারণা তিনি পৃথিবীর সবকিছু জানেন, মুখ বাঁকা করে বললেন, তুই জানিস পৃথিবীতে ছেলে থেকে মেয়ের সংখ্যা বেশি?

টুটুল বলল, জানি। তার কারণ বাচ্চার যখন জন্ম হয় তখন ছোট মেয়েদের থেকে ছোট ছেলেরা হয় দুর্বল—তারা সহজে মারা যায়। তাছাড়া মেয়েদের আয়ু বেশি হয়। তাই পৃথিবীতে মেয়ের সংখ্যা বেশি। আসলে পৃথিবীতে সমান সমান ছেলে আর মেয়ের জন্ম হয়।

পুরো ব্যাপারটার এ রকম একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার পরও বড়রা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হল না। ছোট চাচা চোখ লাল করে টুটুলের দিকে তাকালেন, মেজো চাচি ভুরু কুঁচকে ফেললেন আর আম্মা ধমক দিয়ে বললেন, যা ভাগ এখান থেকে। সবসময় শুধু বড়দের কথার মাঝে নাক গলানো।

টুটুল ইচ্ছা করলেই বলতে পারত সে মোটেও বড়দের কথার মাঝে নাক গলাচ্ছে না—একটা অবৈজ্ঞানিক কথাকে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করছে। কিন্তু সে তার চেষ্টাও করল না—তার বিজ্ঞানী মন অনেক আগেই আবিষ্কার করেছে, বড়রা ছোটদের মানুষ হিসেবে গণ্য করে না, তাদের সাথে যুক্তিতর্ক করা সময় নষ্ট এবং বকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু না। সে সাথে সাথে ঘর থেকে সরে পড়ল।

তারপর যেমন ধরা যাক এক রাত্রে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার ব্যাপারটা। ঘুম থেকে জেগে উঠে টুটুল দেখে তার ঘরে চেয়ারে একজন মানুষ চুপচাপ বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য যে কেউ হলে চিৎকার করে একটা তুলকালাম কাণ্ড করে ফেলত, টুটুল কিন্তু করল না—সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেলে নিজেকে বলল, এটা ভূত নয়, কারণ পৃথিবীতে ভূত বলে কিছু নেই। নিশ্চয় আমি ভুল দেখেছি। খানিকক্ষণ পর চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে ভুল নয়, সত্যি সত্যি একটা মানুষ চেয়ারে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। টুটুল আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। একটা চিৎকার প্রায় দিয়েই ফেলছিল, কিন্তু অনেক কষ্ট করে নিজেকে থামিয়ে নিজেকে বোঝাল, এটা ভূত নয়, চোর হতে পারে—কিন্তু চোরেরা চেয়ারে বসে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে কেন? তবু সে ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে চোখ খুলে জিজ্ঞেস করল, কে?

মানুষটা কোনো উত্তর দিল না এবং চেয়ারে নড়লও না। টুটুল বিজ্ঞানী বলে তার বালিশের নিচে দুইটা চুম্বক, দশ গজ এনামেল কোটেড তার এবং ছোট একটা টর্চলাইট থাকে। সে টর্চলাইটটা বের করে জ্বালতেই চেয়ারে বসে থাকা মানুষটা চোখের পলকে

www.MurchOna.com

এলোমেলো করে রাখা একটা কম্বলে পাল্টে গেল! অন্ধকারে সাধারণ জিনিস যে কী অসাধারণ মনে হতে পারে সেটা টুটুল সেদিন নূতন করে আবিষ্কার করল।

এ রকম অসংখ্য উদাহরণ আছে, যেগুলো শুধুমাত্র একজন সত্যিকার বিজ্ঞানীর জীবনে ঘটতে পারে। এখন কেউ এই ঘটনাগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, কিন্তু একদিন যখন সে একজন বড় বিজ্ঞানী হবেন তখন সবাই যে অনেক বড় গলায় গল্পগুলো বলাবলি করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই টুটুল একদিন সকালে খাবারের টেবিলে একটা ডিম নিয়ে এসে বলল, এই ডিমটাকে কে ভাঙতে পারবে?

খাবারের টেবিলে যারা ছিল তারা একটু অবাক হয়ে বলল, ডিম ভাঙা আবার এমন কী কঠিন ব্যাপার?

টুটুল রহস্যের ভঙ্গি করে বলল, ভাঙতে হবে আমি যেভাবে বলব সেভাবে।

টুটুলের বড় ভাই বাবুল ক্লাস টেনে পড়ে, সে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, সেটা কীভাবে?

ডিমের মাঝখানে এক হাত দিয়ে ধরে চাপ দিয়ে। কোথাও ঠোকা দেয়া যাবে না—

টেবিলে যারা ছিল তারা একে একে চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই ভাঙতে পারল না। একটা ডিমকে দেখে মনে হয় ভাঙা কত সহজ, কিন্তু সেটা এ রকম শক্ত হবে কে জানত? টুটুলের বোন তানিয়া জিজ্ঞেস করল, ভাঙতে পারছি না কেন রে ডিমটা?

টুটুল মুখে একটা বিজয়ীর ভাব ফুটিয়ে বলল, ডিমের খোসা আসলে খুব শক্ত। এই জন্যে এটাকে কোথাও ঠোকা দিয়ে ভাঙতে হয়। তখন সমস্ত শক্তিটা একটা বিন্দু দিয়ে কাজ করে বলে বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু যদি—

এ রকম সময় ছোট চাচা এসে বললেন, কী হচ্ছে ওখানে?

তানিয়া বলল, একটা ডিম ভাঙতে পারছে না কেউ।

ছোট চাচা মুখে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে বললেন, এত বড় বীরপুরুষ কেউ ডিম ভাঙতে পারছে না? কিসের ডিম এটা?

টুটুল বলল, মুরগির ডিম। হাত দিয়ে চেপে ভাঙতে হবে।

দেখি। ছোট চাচা হাত বাড়ালেন।

টুটুল ডিমটা এগিয়ে দেয়। ডিমের মাঝখানে হাত দিয়ে ধরে বললেন, এভাবে?

হ্যাঁ।

ছোট চাচা চাপ দিলেন এবং হঠাৎ কড়াৎ শব্দ করে ডিমটা ভেঙে গিয়ে ভেতরের সবকিছু ছিটকে বের হয়ে এল। টুটুল কাছেই ছিল, তার মুখে এবং শার্টে সেইসব পড়ে একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল।

খাবার টেবিলে যারা ছিল এবং ছোট চাচা হা-হা করে হাসতে শুরু করে। অপ্রস্তুত টুটুল মুখ মুছতে মুছতে বলল, কেমন করে করলে?

ছোট চাচা তখনো হা-হা করে হাসছেন। টুটুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উজ্জ্বল চোখে বলল, তোমার হাতে আংটি—

ছোট চাচা টুটুলের কথার বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। তখনো হাসতে লাগলেন। টুটুল

www.MurchOna.com

বলল, তোমার হাতে আংটি ছিল, আংটি থাকলে সেখানে শক্তিটা এক বিন্দুতে কাজ করে। সেই জন্যে ভেঙেছে—

কেউ টুটুলের কথায় কোনো গুরুত্ব দিল না। সে বলেছিল ডিমটা ভাঙতে পারবে না, কিন্তু তবু ভাঙা গেছে এবং তার থেকে বড় কথা সেটা টুটুলের মুখে গিয়ে লেগে তাকে অপ্রস্তুত করা গেছে—সবাই সেই আনন্দেই আত্মহারা। শুধু তাই না, আম্মা এসে একটা ডিম নষ্ট করার জন্যে আর শার্টটাকে নোংরা করার জন্যে টুটুলকে আচ্ছা করে বকে দিলেন।

অন্য যে কেউ হলে রাগে-দুঃখে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে যেত, কিন্তু টুটুল বিবাগী হল না। বরং আঙুলে আংটি থাকলে সেটা দিয়ে যে শক্তিটাকে এক বিন্দু দিয়ে প্রয়োগ করে ডিমটা ভাঙা যায় এই সত্যটা আবিষ্কার করে খুব খুশি হয়ে উঠল।

এর কয়দিন পরের কথা। হঠাৎ করে দেখা গেল টুটুল ঘরের মাঝখানে একটা ফুটবল এবং টেনিস বল নিয়ে কিছু একটা পরীক্ষা করছে। তানিয়া জিজ্ঞেস করল, কী করছিস টুটুল?

টুটুল একগাল হেসে বলল, একটা ফুটবলের উপর একটা টেনিস বল রেখে ছেড়ে দিলে দেখ কী মজা হয়!

কী হয়?

ফুটবলটা নিচে পড়ে যখন উল্টো দিকে আসে তখন টেনিস বলটাকে দেয় এক ধাক্কা—ঠিক যেন ক্রিকেট ব্যাটের মতো আর পাঁই করে টেনিস বল ছুটে যায় উপরে।

তানিয়া কৌতূহলী চোখে বলল, দেখি—

টুটুল সাবধানে ফুটবলের উপরে টেনিস বলটা রেখে উপর থেকে ছেড়ে দিল—দুটি বল একসাথে নিচে এসে পড়ল তারপর হঠাৎ ম্যাজিকের মতো টেনিস বলটা গুলির মতো উপরে ছুটে যায়, ছাদে ধাক্কা লেগে ছিটকে আসে নিচে—যেন বলটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

তানিয়া টুটুল থেকে এক ক্লাস উপরে পড়ে—টুটুলের কাছে কিছু জানতে চাইলে তার সম্মানহানি হয়, তবু সে জিজ্ঞেস করে ফেলল, কেমন করে হল বল দেখি—

টুটুল আবার তার বোনকে বোঝাতে শুরু করল। সে যেমন চট করে বিজ্ঞানের সবকিছু বুঝে ফেলে অন্যদের বেলায় সেটা সত্যি নয়, তার অনেকক্ষণ লাগল বোঝাতে।

ব্যাপারটা আরো কয়েকবার দেখানো হল এবং এক সময় ছোট চাচাও এসে তার সেই বিখ্যাত তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে বললেন, কী হচ্ছে এখানে?

টুটুল ছোট চাচাকে ব্যাপারটা বোঝাল। ছোট চাচা মুখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিটা ধরে রেখে বললেন, দেখা দেখি।

টুটুল সাবধানে টেনিস বলটা ফুটবলের উপরে রেখে দুটি ছেড়ে দিল। সম্ভবত টেনিস বলটা ঠিক জায়গায় রাখা হয় নি, গড়িয়ে একপাশে চলে এসেছিল, তাই যখন ফুটবলটা নিচে এসে পড়ল আর টেনিস বলটা গুলির মতো ছুটে এল, সেটা ছাদের দিকে না গিয়ে সেটা ছুটে এল টুটুলের মুখের দিকে। এত জোরে সেটা তার মুখে এসে লাগল যে টুটুল এক মুহূর্তের জন্যে চোখে অন্ধকার দেখে সাবধানে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

কোনোমতে দাঁড়িয়ে রইল, মুখের মাঝে রক্তের নোনা স্বাদ পাচ্ছিল, ঠোঁট নিশ্চয়ই কেটে গেছে।

যখন টুটুল শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছে তখন তাকিয়ে দেখে ছোট চাচা পেটে হাত দিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছেন। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেছে এবং তার দেখাদেখি অন্যেরাও হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। রাগে-দুঃখে টুটুলের চোখে পানি এসে গেল—টেনিস বলটা কেন এত জোরে ছুটে আসে বিজ্ঞানের এই চমৎকার কারসাজিটা কেউ একটুও উপভোগ করল না—উপভোগ করল তার ব্যথা পাওয়াটা!

এরপর বেশ কিছুদিন বিজ্ঞানের যাবতীয় গবেষণা টুটুল নিজের মাঝেই গোপন রাখল। এই বাসায় যখন কেউ তার গবেষণার অর্থ বুঝতে পারবে না, তাদের পেছনে সময় নষ্ট করে কী লাভ। সে এর মাঝে এফ. এম. ট্রান্সমিটার তৈরি করল, ব্যারোমিটার তৈরি করল এমন কি বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে এ রকম একটা কম্পিউটার তৈরি করে ফেলল। এই বাসায় কেউ সেটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে না বলে কাউকে কিছু বলল না।

একদিন দুপুরবেলা টুটুল স্কুল থেকে বাসায় এসে দেখে ছোট চাচার ক্লাসের কয়েকজন মেয়ে বাসায় বেড়াতে এসেছে এবং ছোট চাচা খুব হইচই করে তাদের সাথে লুডু খেলছেন। কোনো বয়স্ক মানুষ যে লুডু খেলতে পারে টুটুল জিনিসটা বিশ্বাসই করতে পারে না। টুটুল হাতমুখ ধুয়ে জেলি দিয়ে এক টুকরো রুটি খেয়ে বাইরে বের হয়ে দেখে ছোট চাচা তখনো হইচই করে লুডু খেলছেন, তার ভাবভঙ্গি দেখে মেয়েগুলো হেসে গড়িয়ে পড়ছে, আর ছোট চাচা সেটা দেখে খুব মজা পাচ্ছেন। টুটুল শুনল ছোট চাচা বলছেন, তোমরা লুডু খেলতেই জান না। লুডু খেলার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ছয় মারা। ছয় মারার একটা নিয়ম আছে—খানিকক্ষণ ঝাঁকিয়ে পুট করে ঢেলে দিতে হয়। এমনভাবে ঢালবে যেন আড়াইবার উল্টে যায়—তাহলেই ছয়!

টুটুলের বিজ্ঞানী মন সাথে সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফেলল। অন্য কেউ হলে সে প্রতিবাদ করে ফেলত; কিন্তু ছোট চাচা হচ্ছেন এক নম্বর যন্ত্রণা, তাই সে কিছু বলল না। ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে শুনল, একটা মেয়ে ছোট চাচাকে আহ্লাদী গলায় বলছে, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও না গো, কেমন করে ছয় মারে—

ছোট চাচা বললেন, এই নাও, শিখিয়ে দিই। এইভাবে ধরে ঝাঁকাও—

টুটুল আর পারল না। একটু এগিয়ে এসে বলল, ছয় মারার কোনো নিয়ম নেই।

টুটুলের কথা শুনে ছোট চাচা অসম্ভব বিরক্ত হলেন। মেয়েগুলো না থাকলে টুটুলের কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন সেটা করতে পারছিলেন না, রাগ চেপে বললেন, টুটুল! তোকে এখানে কে ডেকেছে?

টুটুল উদাস গলায় বলল, কেউ ডাকে নি, কিন্তু তুমি অবৈজ্ঞানিক কথা বলছ তাই তোমাকে ঠিক করে দিচ্ছি।

ছোট চাচা চোখ লাল করে বললেন, আমি অবৈজ্ঞানিক কথা বলছি?

হ্যাঁ।

আমি কী অবৈজ্ঞানিক কথা বলেছি?

www.MurchOna.com

তুমি ছয় মারার নিয়ম শেখাচ্ছ। ছয় মারার কোনো নিয়ম নেই। ছয়বার মারলে এমনিতেই একবার ছয় পড়ে।

ছোট চাচা থতমত খেয়ে কী বলবেন বুঝতে না পেরে রাগ রাগ মুখে বললেন, ছয়বার মারলে একবার ছয় পড়ে?

টুটুল মাথা নেড়ে বলল, শুদ্ধ করে যদি বলতে চাও তাহলে বলবে ছয়বার মারলে একবার ছয় পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

এইরকম সময় একটা মেয়ে হি-হি করে হেসে বলল, ওমা ছেলেটা কী কিউট! কী সুন্দর বড়দের মতো কথা বলে!

এটা শুনে ছোট চাচা আরো রেগে গেলেন। চাপা গলায় মেয়েটাকে বললেন, কিউট না ছাই! এর সাথে তো থাকতে হয় না তাই জান না—এ হচ্ছে এই বাসার মূর্তিমান যন্ত্রণা।

আরেকজন মেয়ে বলল, যন্ত্রণা কেন হবে? কী সুইট ছেলেটা! তোমার নেফ্যু?

ছোট চাচা কোনো উত্তর দিলেন না, রাগ রাগ চোখে টুটুলকে বললেন, তুই কী বললি? ছয়বার মারলে একবার ছয় পড়বে?

সম্ভাবনা আছে। যদি সত্যিই ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে চাও তাহলে বেশিবার মারতে হবে।

কত বার?

যেমন মনে কর বারবার মারলে দুইবার ছয় পড়ার সম্ভাবনা। আঠারবার মারলে তিনবার, চব্বিশবার মারলে চারবার, তিরিশবার মারলে পাঁচবার।

ছোট চাচা হঠাৎ কেমন জানি রেগে উঠলেন, চোখ ছোট ছোট করে বললেন, ঠিক আছে আমি তিরিশবার মারব, তুই বলছিস তাহলে পাঁচবার ছয় পড়বে?

টুটুল একটু অবাক হয়ে ছোট চাচার দিকে তাকাল, বলল সম্ভাবনা খুব বেশি।

ছোট চাচা হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, উকিলের মতো কথা বলিস না। পড়বে কি পড়বে না বল।

টুটুল বলল, ঠিক আছে যাও, পড়বে।

আর যদি না পড়ে?

তাহলে কী?

ছোট চাচা হিংস্র মুখে বললেন, তাহলে তোকে এমন পেঁদানি দেব যে জন্মের মতো বিজ্ঞানীগিরি ছুটে যাবে।

ঘরের পরিবেশটা হঠাৎ করে কেমন জানি অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। মেয়েগুলো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছোট চাচা ছক্কাটা ঢেলে দিয়ে গুনলেন এক। তারপর দ্বিতীয়বার ঢেলে বললেন, দুই। তৃতীয়বার ঢেলে বললেন তিন।

ছয়বারের মাঝে প্রথম ছয়টা ওঠার কথা ছিল, কিন্তু উঠল না। টুটুল অবশ্যি অবাক হল না। সম্ভাবনার কথা কেউ বলতে পারে না। প্রথম ছয়বারে একবারও না উঠে পরের দুইবারে পর পর দুইবার উঠে যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেল বারবার ঢালার পরেও একবার ছয় পড়ল না। ছোট চাচার মুখে এবারে সূক্ষ্ম একটা হাসি খেলতে লাগল।

যখন আঠারবার মারার পরেও একটা ছয়ও পড়ল না তখন টুটুল অবাক হয়ে যায়। অন্য সময় হলে সে শুধু অবাক হত—এখন সে একটু একটু ভয় পেতে থাকে। ছোট চাচা

www.MurchOna.com

মানুষটা সুবিধের নয়—তাকে কীভাবে শাস্তি দেবেন কে জানে। বাইরের মেয়েদের সামনে অপমান না করে বসেন।

টুটুল একটু এগিয়ে এল—এর মাঝে কোনো হাতের চালাকি আছে কি না কে জানে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তার মাঝে ছোট চাচা আবার মারলেন, একটা চার পড়ল। হাতের কোনো চালাকি নেই, সত্যিই চার পড়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার—আজকেই এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে? ছোট চাচা আবার মারলেন, একটা দুই পড়ল।

টুটুল খুব সাবধানে একটা নিশ্বাস ফেলল। তিরিশবারের মাঝে পাঁচবার ছয় পড়ার কথা ছিল। এর মাঝে বিশবার মারা হয়ে গেছে একবারও ছয় পড়ে নি। ছোট চাচার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে পরের দশবারে পাঁচবার ছয় পড়তে হবে, তার সম্ভাবনা খুব কম। এ রকম ব্যাপার আজকেই তার সাথে ঘটল। দুঃখে টুটুলের চোখে পানি এসে যেতে চায়।

ছোট চাচা হঠাৎ করে বেশি রকম কথা বলতে শুরু করেন। টুটুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রে সাইন্টিস? তুই না বলেছিলি ছয়বারে একবার করে ছয় পড়ে? কোথায় গেল ছয়গুলো?

টুটুল কিছু বলল না, তার কিছু বলার নেই। ছোট চাচা আবার মারলেন, এবারেও ছয় নেই, একটা এক! ছোট চাচা জোরে জোরে হেসে উঠে টিটকারি মেরে বললেন, দ্যাখ দ্যাখ ছক্কাটা কী রকম অবৈজ্ঞানিক! যখন ছয় পড়ার কথা তখন পড়ছে কিনা এক! কী অন্যায়! কী ঘোরতর অন্যায়!

ছোট চাচার চেঁচামেচি শুনে অন্যেরাও ঘরে এসে হাজির হয়েছে, ছোট চাচা সগর্বে তাদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। টুটুল বলেছে তিরিশবার মারলে মোট পাঁচবার ছয় পড়বে, কিন্তু পড়ছে না। তিনি তিরিশবার মারবেন তারপর টুটুলকে একটা 'পেঁদানি' দেবেন—পেঁদানি কথাটা বললেন খুব কুৎসিতভাবে। সবাই মনে হয় ব্যাপারটা উপভোগ করতে শুরু করেছে, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে লুডুর বোর্ড আর ছোট চাচাকে।

ছোট চাচা ছক্কাটাকে বার কয়েক ঝাঁকিয়ে আবার মারলেন, এবারেও ছক্কাটা বার কয়েক গড়িয়ে একটা তিন দেখিয়ে স্থির হল। ছোট চাচা জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে বললেন, কী অন্যায়! কী ষড়যন্ত্র! বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কী গভীর ষড়যন্ত্র!

টুটুল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ছোট চাচা তার মাঝে আরো দুবার মেরেছেন। এর মাঝে একটা পাঁচ আরেকটা চার পড়েছে। প্রত্যেকবার ছক্কাটা স্থির হওয়ার সাথে সাথে ঘরের সবাই একটা আনন্দের ধ্বনি করে উঠছে। মনে হচ্ছে সবাই দেখতে চায় ছোট চাচা কেমন করে টুটুলকে পেঁদানি দেন।

ছোট চাচা অনেকক্ষণ ছক্কাটা ঝাঁকিয়ে অনেক রকম অঙ্গভঙ্গি করে সেটাকে বোর্ডের মাঝে মারলেন এবং একটা তিন বের হল। সেটা দেখে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছেন সেরকম ভান করে ভাঙা গলায় ন্যাকামো করে বললেন, আহা রে! কোথায় গেলি আমার ছয়? আমাদের সাইন্টিসের সাথে এত বড় দাগাবাজি করলি তুই?

টুটুল কিছু বলল না। সে টের পাচ্ছে আস্তে আস্তে তার কান লাল হয়ে উঠছে। তানিয়া বলল, আর পাঁচবার বাকি।

ছোট চাচা বললেন, পাঁচবার আর পাঁচটি ছয়। তারপর ছক্কাটি ঝাঁকিয়ে নানারকম

www.MurchOna.com

অঙ্গভঙ্গি করে সেটাকে চাললেন এবং হঠাৎ করে সবাই চুপ করে গেল, শেষ পর্যন্ত একটা ছয় পড়েছে।

ছোট চাচা গম্ভীর হয়ে ছক্কাটা তুলে আবার মারলেন। মনে হল তার ইচ্ছে ছিল একটা ছয়ও যেন না পড়ে। কিন্তু এবারেও একটা ছয় পড়ল এবং হঠাৎ করে ঘরে এক ধরনের নীরবতা নেমে এল।

ছোট চাচা কোনোরকম শব্দ না করে ছক্কাটা তুলে অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁকালেন, তারপর লম্বা করে গড়িয়ে দিলেন। ছক্কাটা যখন স্থির হল তখন দেখা গেল সেখানে আবার একটা ছয় বেরিয়েছে।

ছোট চাচার মুখের চেহারা কেমন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে। তাকে দেখে মনে হতে থাকে কেউ যেন তাকে অপমান করে বসেছে। তিনি ছক্কাটা তুলে আবার চাললেন, আবারো ছয় বের হল এবং সাথে সাথে ঘরে একটা বিস্ময়ধ্বনি শোনা যায়। ছোট চাচার ক্লাসের একটা মেয়ে বলল, কী আশ্চর্য!

ছোট চাচা কোনো কথা বললেন না। তাকে কেমন জানি অসুস্থ দেখাতে থাকে। ছক্কাটা তুলে তিনি কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে হতে থাকে তিনি ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তার ক্লাসের মেয়েটি বলল, কী হল? মারছ না কেন?

হ্যাঁ মারছি। ছোট চাচা তবু ছক্কাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

টুটুল ছোট চাচার দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারল এবারেও একটি ছয় পড়বে। কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক—তবুও টুটুল ব্যাপারটিতে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল। সে দেখল ছোট চাচা কাঁপা হাতে ছক্কাটিকে নিয়ে এগিয়ে আসছেন—সেটাকে ঝাঁকালেন এবং গড়িয়ে দিলেন।

ছক্কাটি গড়াতে শুরু করেছে, এক্ষুনি সেটা স্থির হয়ে দাঁড়াবে—টুটুল যে মনেপ্রাণে একজন বিজ্ঞানী—সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক একটা ব্যাপার দেখার জন্যে নিশ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

www.MurchOna.com

বিলু ও তার মৌমাছি

বিলু আর তার বাবা যে গ্রামটাতে থাকে তার নাম পলাশপুর, গ্রামটা চন্দ্রা নদীর তীরে। বিলুর মা মারা যাবার আগে তারা থাকত ঢাকা শহরে। বিলুর বাবা চাকরি করতেন একটা বিদেশি ফার্মে। তাদের বাসা ছিল সাততলার উপরে একটা চকচকে ফ্ল্যাটে। বিলু যেত একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। তার মা গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা যাবার পর সবকিছু কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। তার বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনেকদিন ঘরে বসে রইলেন। তারপর একদিন বিলুকে বললেন, এখানে আমার কিছুই ভালো লাগছে না রে!

বিলু তার বাবাকে খুব ভালবাসে, বলল, কী করবে বাবা?

চল অন্য কোথাও যাই।

কোথায় যাবে বাবা?

নিরিবিলি একটা গ্রামে।

বিলু বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, চল বাবা।

বাবা মাথা চুলকে বললেন, ভালো স্কুল থাকবে না কিন্তু!

না থাকল। বিলু দাঁত বের করে হেসে বলল, স্কুল আমার এমনিতেই ভালো লাগে না।

বাবার পরিচিত যত আত্মীয়স্বজন রয়েছেন সবাই বাবাকে খুব বোঝাল, বাবা কারো কথা শুনলেন না। একদিন চন্দ্রা নদীর তীরে পলাশপুর গ্রামে উঠে এলেন। গ্রামের লোকেরা অবশ্যি বিলুকে আর বাবাকে দেখে খুব খুশি হল। বাবা জুওলজিতে পি.এইচ.ডি করেছেন বলে তার নামের আগে একটা ডক্টর আছে। গ্রামের সবাই তাই ধরে নিল বাবা বুঝি ডাক্তার। তারা বাবার কাছে নানারকম অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য আসতে লাগল। বাবা প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনি রোগী দেখার ডাক্তার না। কিন্তু তাতে খুব লাভ হল না। শেষে বাবা হাল ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করে দিলেন। বেশিরভাগই সহজ চিকিৎসা, জ্বর ডায়রিয়া আর খোশপাঁচড়া। যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয়

বাবা শহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতেন। অল্পদিনে এই এলাকায় বাবার খুব নামডাক হয়ে গেল।

বাবা তার রোগীদের কাছ থেকে কোনো পয়সাকড়ি নিতেন না। সবাই তাই বাবাকে বুদ্ধি দিল ইটের ভাটা না হয় রাইস মিল তৈরি করতে। বাবা সেসব না করে মৌমাছির ফার্ম খুললেন। মৌমাছির ফার্ম তৈরি করা যায় গ্রামের লোকেরা জানত না। তাই অনেক দূর দূর থেকে সবাই বাবার মৌমাছির ফার্ম দেখতে আসত। বড় বড় কাচের জানালা মতোন ছিল, তার মাঝে মৌমাছি চাক তৈরি করেছে, বাইরে থেকে দেখা যেত ভেতরে হাজার হাজার মৌমাছি ছোটাছুটি করতে। মৌমাছিরা ভারি পরিশ্রমী! এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে দিনরাত ছোটাছুটি করছে।

বিলু প্রথম প্রথম ভাবত মৌমাছিরা বুঝি এমনিই ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করছে। বাবার সাথে সাথে মৌমাছি দেখতে দেখতে সে আবিষ্কার করল সেটা ঠিক নয়। মৌমাছিরা নিজেদের মাঝে নানারকম খবরাখবর দেয়ানেয়া করে। ব্যাপারটা কীভাবে হয় জানার পর বিলুর হঠাৎ করে মৌমাছি সম্পর্কে কৌতূহল এক শ গুণ বেড়ে যায়। মানুষের কোনো বিষয়ে একবার কৌতূহল জন্মে গেলে সে সেই ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি শিখে যায়। তাই বছরখানেকের মাঝেই বিলু হয়ে গেল মৌমাছি বিশেষজ্ঞ। বিলুর বাবাও মৌমাছি সম্পর্কে জানেন। কিন্তু দেখা গেল কিছু কিছু ব্যাপারে বিলু তার বাবার থেকেও বেশি জানে।

গ্রামে এসে বিলু বেশ কয়দিন একা একা থাকত। প্রথম প্রথম গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাথে তার সেরকম বন্ধুত্ব হল না। সবাই গ্রাম্যসুরে কথা বলে, অনেক সময় তাদের কথা ভালো করে বুঝতেও পারত না। কিন্তু একবার তাদের সাথে পরিচয় হবার পর দেখা গেল গ্রামের ছেলেমেয়েরা বন্ধু হিসাবে একেবারে এক নম্বর। তারা ইংরেজি একেবারে জানে না, অঙ্ক আর বিজ্ঞানে যাচ্ছেতাই, কিন্তু স্কুলের বাইরের সব ব্যাপারে তাদের মতো একজন মানুষ হয় না। তারা সবাই একেবারে মাছের মতো সাঁতার কাটতে পারে, জেলেদের মতো নৌকা বাইতে পারে, বানরের মতো গাছে উঠতে পারে। তারা ছাতার শিক দিয়ে পাখি ধরার ফাঁদ তৈরি করতে পারে, পিঁপড়ার ডিম দিয়ে মাছ ধরতে পারে, তারা দাঁত দিয়ে কামড়ে আখের ছিলকে সরিয়ে কচকচ করে খেতে পারে। যারা একটু বেশি চালু ধরনের তারা বগলে হাত দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করতে পারে, চোখের পাতা উল্টিয়ে ভূত সাজতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, গ্রামের ছেলেদের একবার বন্ধু হিসেবে অভ্যাস হয়ে গেলে শহরের ছেলেদের একেবারে পানসে মনে হবে।

বিলুর সময় তখন বেশ ভালোই কাটছে। সে তার সব বন্ধুদের ইংরেজি হোমওয়ার্ক করে দেয় বলে বন্ধুরাও তাকে খুব পছন্দ করে। সারাদিন স্কুল করে বিকেলে তারা নদীর তীরে একটা মাঠে কাদা মেখে হা-ডু-ডু না হয় ফুটবল খেলে। খেলা শেষে তারা লাফিয়ে নদীতে নেমে পড়ে নদী তোলপাড় করে সাঁতার কাটে।

বিলুর দিন যখন মোটামুটি বেশ আনন্দের মাঝে কাটছে তখন একদিন তার জীবনে একটা যন্ত্রণার উদয় হল। যন্ত্রণাটির নাম রনি। সে ঢাকায় একটা স্কুলে পড়ে। এখানে তার নানার বাড়ি, গরমের ছুটিতে নানা বাড়ি বেড়াতে এসেছে। প্রথম দিন রনির সাথে তাদের দেখা হল নদীর তীরে তাদের খেলার মাঠে। হা-ডু-ডু খেলায় তারা সবাই মিলে ফারুখকে

www.MurchOna.com

কাদার মাঝে চেপে ধরেছে, ফারুখ ক্রমাগত হুটোপুটি করে পিছলে বের হয়ে আসতে চেষ্টা করছে এবং তাই নিয়ে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। তখন হঠাৎ শুনল কে যেন বলল, হাউ ডিসগাস্টিং! তাই শুনে বিলু চমকে উঠে মাথা তুলে তাকাল এবং দেখতে পেল ধবধবে পরিষ্কার জামাজুতো পরে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—আর এই ফাঁকে ফারুখ পিছলে বের হয়ে গেল। ছেলেটি এবারে মাটিতে থুতু ফেলে পাশে দাঁড়ানো পুতুলের মতো দেখতে তার ছোট বোনকে আবার বলল, হাউ ডিসগাস্টিং!

ছোট বোনটি কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। তখন সেজেগুজে থাকা ছেলেটি ঘেন্নায় বমি এসে যাচ্ছে এ রকম ভান করে হেঁটে হেঁটে নদীর তীরের দিকে চলে গেল। বিলুর বন্ধুরা তখন খেলা থামিয়ে চোখ বড় বড় করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। ফারুখ দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, দেওয়ান সাহেবের নাতি। নাম রনি।

নান্টু বলল, আলিশান বড়লোক। ঢাকায় সাততলা বাড়ি।

জলিল বলল, দুইটা গাড়ি। একটা গাড়ি এয়ারঘণ্টিশন।

বিলু বলল, এয়ারঘণ্টিশন না এয়ারকন্ডিশন।

জলিল কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, একই কথা।

আজরফ বলল, গতবার যখন এসেছিল একটা খেলনা গাড়ি এনেছিল, সেটাকে দূর থেকে চালায়। তাজ্জব ব্যাপার।

বিলু বলল, তাজ্জবের কী আছে। রিমোট কন্ট্রোল।

তোমার আছে?

বিলু একটা নিশ্বাস ফেলল। তার একসময় সবকিছু ছিল। এখন কিছু নেই। ইচ্ছে করেই আনে নি। গ্রামের রাস্তায় রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি মনে হয় খুব জঘন্য দেখাবে।

বিলু আবার খেলা শুরু করতে চাচ্ছিল; কিন্তু দেখা গেল অন্যদের এখন আর খেলায় বেশি উৎসাহ নেই। দেওয়ান সাহেবের নাতি রনি কী করে একটা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখাতেই তাদের বেশি উৎসাহ। তারা চোখ বড় বড় করে রনির পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল আর রনি মুখে এমন ভাব করতে লাগল যেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে বা আর কিছু! বিলুর এমন মেজাজ খারাপ হল যে বলার নয়।

পরদিন স্কুলে অঙ্ক ক্লাসে হঠাৎ করে হেডমাস্টার রনিকে নিয়ে এসে তার দাড়ি নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললেন, এই হচ্ছে রনি। আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি সাহেবের নাতি। সে কখনো গ্রামের স্কুল দেখে নাই। তাই দেখতে এসেছে। শহরের স্কুলে কেমন করে পড়াশোনা হয় সে সেটাও তোমাদের বলবে। ক্লাসের সব ছেলেমেয়ের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর তাই দেখে বিলুর আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

রনি ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইংরেজি আর ভাঙা এক রকমের বাংলায় তার স্কুল যে কত ভালো, কত পরিষ্কার, মোটেও এই স্কুলের মতো নোংরা না, তারা যে কত রকম নতুন পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে এবং এই স্কুলে সবাই যেটা ক্লাস নাইন–টেনে শেখে তারা যে সেই সব জিনিস ক্লাস সিক্স–সেভেনেই শিখে ফেলে সেইসব জিনিস বলতে লাগল। এসব কথা শুনে বিলুর একেবারে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেল অন্য সবাই একরকম মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে রনির কথা শুনছে।

www.MurchOna.com

রনির ব্যাপারটা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সেইদিন বিকালে। স্কুল শেষ করে বাবার সাথে মৌমাছি ফার্মে খানিকক্ষণ কাজ করে নদীতীরে খেলতে গিয়ে দেখে সেখানে কয়েকজন মানুষ গর্ত করে বাঁশ পুঁতছে। রনি পকেটে হাত দিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় কাজের খবরদারি করছে। বিলু অবাক হয়ে কাছে এগিয়ে গেল। রনি এমন ভান করল যেন সে তাকে দেখতেই পায় নি। যে মানুষগুলো বাঁশ পুঁতছে তাদের একজনের নাম কাজেম আলি, সে বিলুকে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, বিলু বাজান কেমুন আছেন?

বিলু বলল, ভালো। তারপর জিজ্ঞেস করল, কাজেম চাচা এখানে কী করছেন?

কিলাব হাউচ তৈরি হচ্ছে।

ক্লাব হাউজ?

জে। বাঁশ পুঁতে উঁচু ঘর তৈরি হবে। সেটারে বলে কিলাব হাউচ।

এইখানে?

জে।

বিলু গলা শক্ত করে বলল, এইখানে আমরা হা-ডু-ডু খেলি।

রনি তখন কাছে এসে কাজেম আলিকে বলল, কথা বলছ কেন? কাজ কর, কালকের মাঝে শেষ করতে হবে।

কাজেম আলি মাথা নেড়ে বলল, জে জে করছি। তারপর খন্তা দিয়ে মাটিতে গর্ত করতে শুরু করল।

বিলুর মাথায় রক্ত উঠে গেল, সে চোখ পাকিয়ে বলল, এখানে কিছু তৈরি করতে পারবে না। এইখানে আমরা খেলি।

রনি বাঁকা করে হেসে বলল, খেল? নাকি কাদায় গড়াগড়ি দেও?

বিলু বলল, আমার যা ইচ্ছা তাই করি। তোমার কী?

রনি হাত ভাঁজ করে বুকের উপর ধরে বলল, এটা আমার নানার প্রপার্টি—এখান থেকে যাও, না হলে তোমার ঘাড় ধরে বের করে দেব।

বিলু বিশ্বাস করতে পারল না যে তাকে কেউ এ রকম করে বলতে পারে। লাফিয়ে উঠে ধরে প্রায় একটা ঘুসি মেরেই বসছিল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিল।

কাজেম আলি তাড়াতাড়ি রনির কাছে এসে বলল, এইভাবে কথা বলে না ছোট সাহেব। ডাক্তার সাহেবের ছেলে—

রনি বলল, আই ডোন্ট কেয়ার। আমার নানার প্রপার্টিতে আমি যা ইচ্ছে তাই করব, আমার ইচ্ছা।

বিলু বুঝতে পারল সে যদি আর কিছুক্ষণ থাকে তাহলেই রনি ছেলেটাকে একটা ধোলাই দিয়ে দেবে। বাবা মারপিট একেবারে পছন্দ করেন না—কাজেই ব্যাপারটাতে আপাতত একটা আনন্দ হলেও পরে অনেক দুঃখ হতে পারে। তাই সে আর কোনো কথা না বলে নিজের বাসায় ফিরে এল।

বিলুর যখন কোনো কারণে মন খারাপ হয় সে তখন মৌমাছিদের নিয়ে খেলা করে, আজকেও তাই শুরু করল। কিছুক্ষণের মাঝেই সে রনির কথা ভুলে গেল, মৌমাছিদের কাজ করতে দেখার মতো আনন্দ আর কোনো কিছুতেই নেই!

www.MurchOna.com

পরদিন ফারুখ খবর আনল 'কিলাব হাউচ' নাকি প্রায় দাঁড়া হয়ে গেছে। ব্যাপারটা একটা মাচা ছাড়া আর কিছু নয়। দুপুরবেলা নান্টু খবর আনল 'কিলাব হাউচে' রনি আর তার ছোট বোন বসে বসে রুটি খাচ্ছে। বাড়াবাড়ি বড়লোকেরা দুপুরবেলায় রুটি খায়। ঢাকা থেকে সেই রুটি আনা হয়েছে। বিকালবেলা জলিল সবচেয়ে বড় খবর আনল, আগামীকাল শহর থেকে রনির বন্ধুরা আসছে—তারা কখনো গ্রাম দেখে নাই, তাই গ্রাম দেখতে আসছে।

শুনে বিলু একটা নিশ্বাস ফেলল। এক রনিকে দিয়েই তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে, এখন যদি এক ডজন রনির মতো চিড়িয়া এসে হাজির হয়, তাহলে তো তার এই এলাকা ছেড়েই চলে যেতে হবে।

পরদিন আজরফ এসে বলল, রনির বন্ধুরা এসে গেছে, তারা সবাই এখন বিশ্রাম নিচ্ছে।

বিলু বলল, তোরা কী করছিস?

আমরা ওদের বাসার কাছে যে জারুল গাছ আছে সেটাতে বসে আছি।

কেন?

রনির বন্ধুরা কী করে দেখতে হবে না? আজরফ আর কোনো কথা না বলে ছুটে চলে গেল।

বিলু সারাদিন তার মৌমাছিদের সাথে সময় কাটাল। সারাদিন তার বন্ধুরা তার সাথে দেখা করতে এল না, সবাই নিশ্চয়ই রনির বন্ধুদের পিছে পিছে ঘুরছে। গ্রামের ছেলেদের এই হচ্ছে সমস্যা। সবকিছুতেই তাদের উৎসাহ—তাদেরকে নিয়ে যে ঠাট্টা তামাশা করছে সেটা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই!

বিকেলবেলা বিলু হাঁটতে বের হল। যাবে না যাবে না করেও সে হেঁটে হেঁটে তাদের খেলার মাঠের কাছে হাজির হল। অনেক দূর থেকে সে অনেকগুলো ছেলের হইচই শুনতে পাচ্ছিল, দূর থেকে তাদের এক নজর দেখেই চলে আসবে ভাবছিল, কিন্তু ফারুখ তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। কাজেই বিলু খুব গম্ভীর হয়ে পকেটে হাত দিয়ে একটু এগিয়ে যায়।

যেখানে তাদের খেলার মাঠ ছিল সেখানে চারটা বাঁশ পুঁতে তার উপর একটা বড় মাচা এবং মাচার উপর ছন দিয়ে একটা চালা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ছেলে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কয়েকজন নিচে দাঁড়িয়ে আছে এবং সবাই মিলে মনে হয় খুব ফুর্তি করছে। ছেলেগুলোর জামাকাপড় খুব পরিষ্কার, চেহারাছবি-স্বাস্থ্যও খুব ভালো—দেখলেই বোঝা যায় এরা বড়লোকের ছেলে। বিলু ভাবছিল সে তার বন্ধুর সাথে এক দুইটা কথা বলেই চলে আসবে। কিন্তু সেটা করা গেল না, তাকে দেখেই রনি মাচার উপর থেকে চিৎকার করে বলল, এসেছে, ওই ছেলেটা এসেছে।

রনির কথা শুনে সব কয়জন ছেলে মাথা ঘুরিয়ে বিলুর দিকে তাকাল। তার সম্পর্কে কী বলছে কে জানে, ছেলেগুলো মুখে এক ধরনের বিদ্রূপের হাসি নিয়ে বিলুর দিকে তাকিয়ে রইল।

বিলু চলেই আসত, তখন একজন ছেলে গলা উঁচিয়ে বলল, এই ছেলে তুই আর তোর বাবা নাকি পাগলা?

www.MurchOna.com

বিলুর মাথায় হঠাৎ মনে হল একটা ছোট বিস্ফোরণ ঘটে গেল। তার কয়েক সেকেন্ড লাগল নিজেকে শান্ত করতে। তারপর সে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটার কাছাকাছি গিয়ে বলল, তুমি কী বললে?

বিলুকে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে ছেলেটা একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে তার অন্য বন্ধুদের কাছে চলে যায়। বিলু কোমরে হাত দিয়ে বলল, তুমি কী বললে?

ছেলেটা এবার গলা উঁচিয়ে বলল, তুই আর তোর বাবা হচ্ছে পাগলা।

বিলু আঙুলটা তুলে বলল, আমি ঠিক দশ মিনিট সময় দিচ্ছি, তুমি এবং তোমার সব বন্ধুরা এই এলাকা থেকে বিদায় হবে। জীবনের মতো বিদায় হবে।

ছেলেগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ঢ্যাঙ্গা একজন বুক চিতিয়ে বিদ্রূপ করে বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ। ঠিক দশ মিনিট। দশ মিনিট পরে যদি তোমাদের একজনও এখানে থাক তোমাদের জান আমি শেষ করব।

রনি এবারে গলা উঁচিয়ে বলল, ধর ব্যাটাকে। গিভ হিম এ থ্রেশিং।

বিলু চোখের পলক না ফেলে রনির দিকে তাকাল এবং প্রায় আট-দশজন ছেলের একজনও রনির কথামতো বিলুকে ধরে মার লাগাবার সাহস পেল না। বিলু ঘুরে দুই পা পিছিয়ে আসে, তারপর দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার ছেলেদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, মনে থাকে যেন ঠিক দশ মিনিট। তার এক সেকেন্ড বেশি না। আমি দশ মিনিট পরে আবার আসব।

বিলু লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে আসতে থাকে। হেঁটে আসতে আসতে শুনল ছেলেগুলো চিৎকার করে তাকে গালিগালাজ করতে করতে হাসাহাসি করছে।

বিলুর সাথে সাথে তার সব বন্ধুরাও চলে আসছিল, বিলু তাদের থামাল। বলল, তোরা আসবি না। তোরা এখানে দাঁড়া। আমি আসছি।

কী করবে তুমি?

দেখবি এক্ষুনি। তোরা থাকিস।

বিলুর বাবা মৌমাছির খাঁচাগুলো সাবধানে পরিষ্কার করছিলেন, বিলুকে ফিরে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, কী হল, এখন ফিরে এলি যে!

এসেছি বাবা। একটু কাজ আছে।

কাজ আছে?

হ্যাঁ বাবা আমার মৌমাছিগুলো দরকার।

কী করবি?

এক জায়গায় পাঠাব। সরে যাও বাবা। আমার সময় নেই একটুও।

বিলুর বাবা একটু হেসে সরে গেলেন।

বিলু মৌমাছির খাঁচার উপর থেকে কাচের জানালা সরিয়ে একটু জায়গা করে নিল। মৌমাছিগুলোকে একটা খবর দিতে হবে।

মৌমাছিদের নিজেদের ভেতরে খবর দেয়ানেয়ার নানারকম নিয়ম রয়েছে। একটা মৌমাছি যখন অন্য একটা মৌমাছিকে দূরে কোথাও যেতে বলতে চায় তখন সেটা ইংরেজি আট বা বাংলা চারের মতো একটা পথ ধরে নাচতে থাকে। কোন দিকে যেতে হবে সেটা

www.MurchOna.com

নির্ভর করে এই ইংরেজি আট বা বাংলা চারের পথটুকু কী রকম তার উপর। পথটা যদি শুইয়ে রাখা চারের মতো হয় তার মানে সোজাসুজি সূর্যের দিকে যেতে হবে। পথটা এর থেকে যত বাঁকা হবে তার মানে সূর্যের দিকের সাথে ততটুকু বাঁকা হয়ে যেতে হবে। মৌমাছি নেচে নেচে মাঝামাঝি অংশে যত সময় নিয়ে পার হয় তত বেশি দূরত্বে যেতে হয়। মৌমাছির এই তথ্যটুকু বিলু প্রথমে বই পড়ে শিখেছিল, তারপর নিজের চোখে বহুবার দেখেছে। মৌমাছিগুলো কোথায় যাবে সেই তাদের নাচ দেখেই বুঝে ফেলে।

মাস দুয়েক আগে সে প্রথম একটা মজার জিনিস করেছে। একটা মৌমাছিকে ধরে চারের মতো পথ ধরে ঘুরিয়ে এনেছে। তাই দেখে অন্য মৌমাছিরা ভেবেছে বুঝি তাদের এখন দূরে কোথাও যেতে হবে! একটু পর সত্যি সত্যি মৌমাছিগুলো বিলুর নির্দেশমতো উড়ে যেতে শুরু করেছে, বিলু ঠিক যেরকম যে দিকে যেতে বলেছে সেদিকে! ব্যাপারটা সে ধীরে ধীরে খুব ভালো করে রপ্ত করেছে। ঠিক যেখানে সে মৌমাছিকে পাঠাতে চায় সে পাঠাতে পারে। একটাকে পাঠাতে পারে, একশটাকে পারে, আবার কয়েক হাজারকেও পাঠাতে পারে। মৌমাছিকে দেখে দেখে সে আরো নানারকম জিনিস আবিষ্কার করেছে। কখনো কখনো তাদেরকে রাগিয়ে দেয়া যায়—অন্য কেউ এসে তাদের মধু খেয়ে ফেলছে এই রকম একটা তথ্য দেয়া যায়। মৌমাছিরা তখন ভীষণ রেগেমেগে ছুটতে থাকে, যাকেই পায় তাকেই হুল ফুটিয়ে দেয়! বিলু আজ তাই করবে। তাদের বলবে মহাবিপদ আসছে, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে আক্রমণ কর। কোথায় আক্রমণ করতে হবে সেটাও বলে দেবে, তাদের খেলার মাঠে যে মাচা তৈরি করা হয়েছে সেখানে!

বিলু খুব সাবধানে দুটি কাঠি দিয়ে একটা মৌমাছিকে চেপে ধরল, সেটা পাখা ঝাপটাতে থাকে। যখন মৌমাছিটা একটু নিস্তেজ হয়ে যায় তখন সে সেটাকে বাংলা চারের মতো পথে ঘোরাতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই অন্য মৌমাছি এসে ভিড় করে এবং কোথায় কেন যেতে হবে বুঝে নেয়। সেটার দেখাদেখি তখন অন্য মৌমাছিগুলোও নাচতে শুরু করে এবং তাদের ঘিরে অন্য মৌমাছিও এসে ভিড় করে। কিছুক্ষণেই সব মৌমাছির মাঝে খবর পৌঁছে যাবে যে তাদের এখন আক্রমণ করতে ছুটে যেতে হবে, দল বেঁধে ছুটে যাবে মৌমাছি!

বিলু সাবধানে মৌমাছির কাচের জানালাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর খেলার মাঠের দিকে হাঁটতে থাকে। সে পাজি ছেলেগুলোকে দশ মিনিট সময় দিয়েছিল। দশ মিনিট পার হওয়ার আগেই মাঠে পৌঁছানো দরকার।

খেলার মাঠে মাচার উপরে ছেলেগুলো সবাই তখনো লাফঝাঁপ দিচ্ছে, বিলু যে সত্যিই দশ মিনিট পর ফিরে আসবে সেটা তাদের কেউ বিশ্বাস করে নি। বিলুকে ফিরে আসতে দেখে তখন সবাই টিটকারি মারতে থাকে। শুধু তাই না, একজন একটা ঢিলও ছুড়ে মারে। বিলু নিজেকে বাঁচিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার আর কিছুই করার দরকার নেই। সে শান্ত গলায় বলল, আমি তোমাদের দশ মিনিট সময় দিয়েছিলাম এখান থেকে পালিয়ে যেতে। দেখতেই পাচ্ছি তোমরা পালাও নি। এখন আমি দশ পর্যন্ত গুনব, এর মাঝে যদি না যাও—

ছেলেগুলোর একজন খারাপ একটা গালি দিয়ে আরেকটা ঢিল ছুড়ল বিলুর দিকে এবং বিলু ঠিক সময়মতো সরে গেল বলে ঢিলটা তার গায়ে লাগল না। সে শান্ত গলায় গুনতে শুরু করে, এক–দুই–তিন—পাঁচ পর্যন্ত গোনার আগেই প্রথম মৌমাছিটি আকাশ থেকে

www.MurchOna.com

নেমে আসে, সেটা একবার ঘুরে সোজাসুজি ঢ্যাঙ্গা ছেলেটার গলায় হুল ফুটিয়ে দিল। ছেলেটা বিকট একটা চিৎকার দিয়ে লাফাতে থাকে এবং কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি নেমে আসে। ছেলেগুলো চিৎকার করে মাচার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে। মৌমাছিগুলো সোজাসুজি এসে হুল ফোটাতে থাকে। বিকট চিৎকার করে ছেলেগুলো ইতস্তত ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় কয়েকবার গড়াগড়ি খেয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়ায় তারপর আবার চিৎকার করে ছুটতে থাকে, শরীরের ইতস্তত জায়গায় খামচাখামচি করতে থাকে। কয়েকজন লাফিয়ে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে কাদার মাঝে গড়াগড়ি খেয়ে উঠে দাঁড়ায় তারপর আতংকে এবং যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে—সেই অবস্থায় তারা প্রাণপণে ছুটতে থাকে এবং চোখের পলকে সব কয়জন তাদের প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

ছেলেগুলো বিকালের ট্রেনেই শহরে ফিরে গেল। স্টেশনে যাবার পথে জারুল গাছে বিলু পা ঝুলিয়ে বসেছিল। ছেলেগুলো তাকে দেখে ভয়ে একেবারে আঁতকে উঠল। মৌমাছির কামড়ে তাদের নাকমুখ ফুলে একেবারে ভয়াবহ অবস্থা। কাউকে আর চেনা যায় না। রনি তার বাবাকে বলল, বাবা ওই যে ছেলেটা আমাদের দিকে মৌমাছি লেলিয়ে দিয়েছে।

রনির বাবা রনির কান ধরে একটা শক্ত চড় দিয়ে বললেন, আবার মিথ্যা কথা? মৌমাছির চাকে ঢিল মেরেছিস না কী, এখন অন্য মানুষকে দোষ? মৌমাছি কি মানুষ যে তাকে কেউ লেলিয়ে দিতে পারে?

www.MurchOna.com

মূর্তি

আমি এই গল্পটি শুনেছি তরফদার সাহেবের মুখে। তরফদার সাহেবের পুরো নাম আজিজ তরফদার। তিনি আমার বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন আমার ছেলেবেলার বন্ধু আনিসের সাথে। আনিস একটু পাগলা গোছের, তার সাথে যারা মেশে তারাও হয় একটু পাগলা গোছের, না হয় তার চাপে খানিকটা পাগলা গোছের হয়ে যায়। যে রাতে সে তরফদার সাহেবকে আমার বাসায় নিয়ে এল সে রাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হচ্ছিল। এ রকম বৃষ্টিতে সুস্থ মানুষও খুব বাড়াবাড়ি দরকার না থাকলে ঘর থেকে বের হয় না। আনিস মাঝরাতে এই বৃষ্টি ভেঙে তরফদার সাহেবকে নিয়ে আমার বাসায় চলে এল। দরজা খুলে তাকে দেখে আমার আঁতকে ওঠার কথা ছিল; কিন্তু আনিসকে দেখে আমি কখনো আঁতকে উঠি না। একবার সে রাত দুটোর সময় একজন কাপালিক সন্ন্যাসীকে নিয়ে হাজির হয়েছিল, শুধু তাই নয় আমার কাছে গাঁজা ছিল না বলে সেই সন্ন্যাসী আমাকে তার চিমটা দিয়ে খোঁচা মারার চেষ্টা করেছিল। সেই তুলনায় আজিজ তরফদার অত্যন্ত ভদ্রমানুষ এবং মাঝরাতে ভিজে চুপসে হাজির হয়ে তার লজ্জার সীমা ছিল না। ব্যাপারটির মাঝে যে কোনো অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে আনিস অবশ্যি সেটা ধরতেই পারল না, আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলল, ইকবাল! তোর কাছে তরফদার সাহেবকে নিয়ে এসেছি।

তরফদার সাহেব বিব্রতভাবে বললেন, আমি এত রাতে আসতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু আনিস কোনো কথা শুনল না।

আমি বললাম, এটি কোনো ব্যাপারই না। আপনি মাথা ঘামাবেন না।

আনিস বলল, তুই যে পুলিশের সাথে কুস্তি করেছিলি সেই গল্পটা বলেছিলাম তরফদার সাহেবকে। শুনে এত হাসলেন যে ভাবলাম তোকে দেখিয়ে নিয়ে যাই!

আমি আমার জীবনে অনেক কিছুই করেছি, একটা দুইটা কাজকে বীরত্বের কাজ হিসেবেও চালিয়ে দেয়া যায়; কিন্তু আনিস আমার সম্পর্কে কিছু বলতে হলে একজন পুলিশের সাথে হাতাহাতি করে এক রাত্রি হাজতবাসের গল্পটি দিয়ে শুরু করে। আমি

www.MurchOna.com

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, শুধু আমাকে দেখানোর জন্যে বৃষ্টির মাঝে উনাকে টেনে আনলি?

আনিস দাঁত বের করে হেসে বলল, শুধু সে জন্যে আনি নি। বৃষ্টির রাতে কফি খেতে খেতে জমাট আড্ডা মারার ইচ্ছে করছে! তোর হাতের কফি একেবারে ফার্স্টক্লাস। আর তরফদার সাহেব হচ্ছেন প্রাক্তন আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট নেতা! এমন সব গল্প জানেন শুনলে হাঁ হয়ে যাবি।

তরফদার সাহেব কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আনিস বাধা দিয়ে বলল, আগেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেছিস কেন। শুকনো তোয়ালে ফোয়ালে কিছু নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি—

আমি তোয়ালে নিয়ে ফিরে এসে দেখি তরফদার সাহেব আমার টেবিলের ওপর রাখা পাথরের মূর্তিটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন, আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী চমৎকার হাতের কাজ! দেখে মনে হয় দক্ষিণ আমেরিকার।

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ, মেক্সিকো থেকে এনেছি। ইনকাদের কোন এক রাজার মূর্তি।

তরফদার সাহেব তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে মূর্তিটি হাত দিয়ে খুব সাবধানে স্পর্শ করলেন, দেখে মনে হল তিনি যেন মূর্তি নয় একটি জীবন্ত মানুষকে স্পর্শ করছেন। আমি বললাম, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে হাত দিয়ে দেখছেন এটা বেঁচে আছে কি না—

তরফদার সাহেব চমকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি সত্যিই তাই দেখছিলাম। মূর্তি নিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে, সেই থেকে কোনো মূর্তি দেখলেই আমি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি—

কী দেখেন?

তরফদার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, দেখি মূর্তিটা জীবন্ত কি না। আমি জানি কথাটা খুব আজগুবি শোনাচ্ছে, কিন্তু—

আনিস হাতে কিল দিয়ে বলল, বৃষ্টিরাতের জন্যে একেবারে পারফেক্ট! ইকবাল, তোর কফি চাপা তাড়াতাড়ি।

তরফদার সাহেব দুর্বলভাবে একবার আপত্তি করার চেষ্টা করে বেশি সুবিধে করতে পারলেন না। মধ্যরাতে যখন তুমুল বর্ষণে বাইরের পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে তখন ঘরের মাঝে কফি খেতে খেতে তরফদার সাহেব যে গল্পটি বলেছিলেন সেটি এ রকম—তার নিজের ভাষাতেই বলা যাক।

আমি তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে, পুলিশের কয়েকটা মামলা ঝুলছে। কিছু মামলা সত্যি কিছু বানানো। অনেক গ্রাম ঘুরে আমি দিনাজপুরের একটি সাঁওতাল পল্লীতে আশ্রয় নিয়েছি। পার্টি থেকে ঠিক করে দেয়া হয়েছে কোথায় থাকব, ছোট একটা কুঁড়েঘরে থাকি, দিনের বেলা ঘর থেকে বের হই না। আমাকে দুইবেলা খাবার এনে দেয় একজন বুড়ো সাঁওতাল। কুচকুচে কালো গায়ের রং, মাথার চুল শণের মতো সাদা। অনেক বয়স মানুষটার, কিন্তু শরীর পাথরের মতো শক্ত। আমার কোনো কাজকর্ম নেই—অনেক বই নিয়ে এসেছি সেগুলো বসে বসে পড়ি। বুড়ো সাঁওতাল প্রথম যখন আমাকে দেখে মনে হয় আমার সম্পর্কে একটা অবিশ্বাস ছিল—আদিবাসী মানুষের জন্যে যেটা খুবই স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে

www.MurchOna.com

সেই অবিশ্বাসটা দূর হয়েছে এবং শেষের দিকে মনে হয় আমাকে সে একটু পছন্দই করা শুরু করেছিল। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল, সারাদিন তুমি কী পড়, বাবু?

আমি বললাম, বই।

কিসের বই? কী লেখা আছে বইয়ে?

আমি হেসে বললাম, কত কী লেখা আছে সে তো বলে শেষ করা যাবে না। ইতিহাসের বই আছে, বিজ্ঞানের বই আছে, ধর্মের বই আছে—

বুড়ো সাঁওতাল উৎসুক মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু এগিয়ে এসে বলল, তোমার কাছে কি পিশাচের বই আছে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, পিশাচ?

হ্যাঁ।

আমি হেসে ফেলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু বুড়োর চোখেমুখে বিচিত্র এক ধরনের কৌতূহলের চিহ্ন দেখে হাসি গোপন করে মুখ গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করলাম, পিশাচের কী জানতে চাও?

এই কেমন করে পিশাচের হাত থেকে বাঁচা যায়?

তোমাকে কোনো পিশাচ যন্ত্রণা দিচ্ছে?

বুড়ো একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, এখনো দিচ্ছে না, কিন্তু দেবে। আমি জানি দেবে—

তুমি কেমন করে জান?

বুড়ো মেঝেতে পা মুড়ে বসেছিল, খানিকক্ষণ দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল তারপর হাতের লাঠিটা দিয়ে খানিকক্ষণ পিঠ চুলকে বলল, পিশাচটা আমার কাছে আছে।

আমি অবাক হয়ে বুড়োর দিকে তাকালাম। ভূতপ্রেত পিশাচের গল্প কে না শুনেছে— কিন্তু সব গল্পেই এই সব ভূতপ্রেত পিশাচ হঠাৎ হঠাৎ এসে দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এই প্রথম একজনকে দেখলাম যে দাবি করছে পিশাচটা তার কাছে আছে। আমি হাসি গোপন করে মুখে প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললাম, তোমার কাছে একটা পিশাচ আছে?

হ্যাঁ।

কী করে পিশাচটা?

এখন কিছু করে না। দেখে তোমার মনে হবে একটা মূর্তি।

আসলে মূর্তি না?

না।

তুমি কেমন করে জান?

এটা আমাকে দিয়েছে আমার গুরু। আমার গুরু আমাকে বলেছে এটা পিশাচ।

আমি একটু হেসে বললাম, তোমার গুরু হয়তো তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে।

মিথ্যে? বুড়ো সাঁওতালটা আমার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকাল আর তার সেই দৃষ্টির সামনে আমি কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেলাম। মিথ্যে বলাবলির ব্যাপারটি এরা মনে হয় এখনো শিখে ওঠে নি। আমি থতমত খেয়ে বললাম, তোমার গুরু কেমন করে জানে এটা পিশাচ?

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, আমার গুরু পিশাচসিদ্ধ ছিলেন। তার গুরু আরো বড়

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

পিশাচসিদ্ধ ছিলেন।

পিশাচসিদ্ধ হলে কী হয় আমি জানি না, তারা কেমন করে পিশাচকে বশ করে তাও জানি না। সত্যি কথা বলতে কী পিশাচ জিনিসটা কী আমার সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই। বুড়ো সাঁওতালের কাছে আমার সেটা নিয়ে শিক্ষা শুরু হল। সে আমাকে জানাল পিশাচ এক ধরনের অপদেবতা। অপদেবতাদের মাঝে উচ্চ শ্রেণী–নিম্ন শ্রেণী আছে, ভালো–খারাপ আছে, শান্ত এবং খেপাও আছে। পিশাচ সে হিসেবে খুব নিম্ন শ্রেণীর, মানুষের শুধু ক্ষতি করতে চায়। তার গুরু এ রকম একটা পিশাচকে ধরে আটকে রেখেছেন। এদেরকে আটকে রাখার নানারকম নিয়মকানুন আছে, তার একটা হচ্ছে মূর্তির মতো তৈরি করে রাখা। ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ এবং কঠিন, মানুষের মৃতদেহ থেকে হাড়–চামড়া নিয়ে তৈরি করতে হয়। ব্যাপারটা বিপজ্জনকও। কারণ মূর্তিটাকে ঠিক করে সংরক্ষণ করে না রাখলে পিশাচ বের হয়ে যেতে পারে।

বুড়ো খুব একাগ্রভাবে গম্ভীর মুখে আমাকে পিশাচ সংরক্ষণের নিয়মকানুন বলে যাচ্ছিল। তার বিশ্বাস কিংবা তার গুরুর কোনোরকম অসম্মান না করে আমি সাবধানে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কি হতে পারে না যে পিশাচটা এখন নেই, মূর্তি থেকে বের হয়ে চলে গেছে?

বুড়ো সাঁওতাল মাথা নাড়ল, হতে পারে; কিন্তু সেটা বোঝা যায়।

কেমন করে বোঝা যায়?

মূর্তিটার পরিবর্তন হয়, হাতপা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নড়ে, খুব আস্তে আস্তে—এক দুই মাস সময় লাগে। সময় সময় মুখের চেহারার পরিবর্তন হয়। বয়স বাড়ে।

বুড়োর কথা শুনে আমার শরীর হঠাৎ কেমন জানি শিরশির করে উঠল। ব্যাপারটি দীর্ঘদিনের লালিত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ চাঁদে গিয়েছে, তাদের তৈরি মহাকাশযান সৌরজগৎ পার হয়ে যাচ্ছে, এই যুগে পিশাচের গল্প বিশ্বাস করা খুব অন্যায় ব্যাপার। কিন্তু কেন জানি না গভীর অরণ্যের পাদদেশে ঝুপড়ি কুঁড়েঘরে উবু হয়ে বসে থাকা একজন বুড়ো সাঁওতালের মুখে এই পিশাচের গল্প শুনে আমার কেমন জানি ভয় করতে লাগল। আমি দুর্বল গলায় বললাম, তুমি আমাকে পিশাচটাকে দেখাতে পারবে?

বুড়ো একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, তুমি দেখতে চাও?

কেন, কোনো অসুবিধে আছে?

না, অসুবিধে নাই। তবে দেখার নিয়মকানুন আছে। পিশাচটাকে রাখতে হয় মাটির নিচে, কাঠের বাক্সে, সেটাকে মন্ত্র লেখা কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখতে হয়। তুমি যদি দেখতে চাও আমি মাটি খুঁড়ে বের করতে পারি।

তুমি সেটা কোথায় পুঁতে রেখেছ?

আমার বাড়ির পেছনে।

ঠিক আছে আমি যাব, আমার তো দিনে বের হওয়া বারণ, আমি রাত্রিবেলা বের হব।

বুড়ো মাথা নাড়ল, বলল, আমি তোমাকে সামনের পূর্ণিমায় নিয়ে যাব।

গল্পের এই পর্যায়ে এসে তরফদার সাহেব একটু থামলেন। খানিকক্ষণ নিজের আঙুলগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, পূর্ণিমা আসার আগেই বুড়ো

সাঁওতালটা মারা গেল। আমরা সাঁওতালদের নিয়ে কাজ করছিলাম, পার্টি থেকে নির্দেশ ছিল তাদেরকে সংগঠিত করার। কিন্তু মানুষগুলো সহজ সরল, রাজনীতির জটিল ব্যাপারগুলোও তাদের নিজেদের মতো সহজ সরল করে বুঝে নেয়; সেটাই হল কাল। পুলিশের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। অনেক সাঁওতাল মারা গেল, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হল। আমি নিজেও বেশ কিছুদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম।

বেশ কিছুদিন পর, অবস্থা একটু শান্ত হলে আমি সেই সাঁওতাল পল্লীতে ফিরে এলাম। তখন সেখানে কেউ নেই, পরিত্যক্ত একটা গ্রাম। আমার সাথে ছিল পরিচিত একটা সাঁওতাল ছেলে, তাকে নিয়ে সেই বুড়ো সাঁওতালের বাড়ি খুঁজে বের করে বাড়ির পেছনে গেলাম। অল্প কিছুদিন আগেও সেটা ছিল ঝকঝকে তকতকে, এই কয়দিনেই সেটা বুনো গাছগাছালিতে ভরে উঠেছে। আমি জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করতেই কোনার দিকে একটা জারুল গাছের নিচে চোখ পড়ল। অনেকগুলো পাথর সেখানে ছোট একটা পিরামিডের মতো স্তূপ করা ছিল, পাথরগুলো সরাতেই দেখা গেল নিচে ঝুরঝুরে মাটি। মাটিগুলো সরাতেই তার নিচে পাওয়া গেল একটা ছোট কাঠের বাক্স। বাক্সটা উপরে তুলে আনলাম, সঙ্গের সাঁওতাল ছেলেটা খুব কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে ছিল, তার ধারণা হল বুড়ো সাঁওতালটা নিশ্চয়ই আমাকে তার গোপন সোনাদানার কথা বলে গিয়েছে, আমি সেটা বের করছি।

কাঠের বাক্সটা যখন বের করা হয়েছে তখন সূর্য ডুবে আবছা অন্ধকার নেমে আসছে। নির্জন পরিত্যক্ত একটা পোড়াবাড়ি, গাছের নিচে রহস্যময় একটা অন্ধকার, সেখানে আমরা বিবর্ণ একটা কাঠের বাক্স নিয়ে বসে আছি, পুরো ব্যাপারটাতেই কেমন জানি একটা গা ছমছম করা ভয়ের ব্যাপার আছে। আমি আমার পকেট-ছুরিটা বের করে সাবধানে চাঁড় দিয়ে বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেললাম, সাথে সাথে আমার স্পষ্ট মনে হল ভেতরে কী যেন ছটফট করে নড়ে উঠল। আমি হঠাৎ করে চমকে পেছনে সরে গেলাম, সাঁওতাল ছেলেটা শক্ত করে তার লাঠিটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চুপচাপ খানিকক্ষণ বাক্সের ভেতরে তাকিয়ে রইলাম, পুরোনো কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা যত্ন করে রাখা আছে। আমি সাহস করে কাপড়ে মোড়ানো জিনিসটা তুলে আনলাম, পরিষ্কার মনে হল হাতের মাঝে জিনিসটা আবার নড়ে উঠল। আমি সেটাকে মনের ভুল বলে গা ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিলাম। তারপর সাবধানে কাপড়টা সরাতে থাকি, যখন জিনিসটার উপর থেকে কাপড়টা সরে গেছে—ভেতর থেকে একটা অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত মূর্তি উঁকি মেরেছে—তখন সাঁওতাল ছেলেটা হঠাৎ একটা অমানুষিক চিৎকার করে লাফিয়ে পেছনে সরে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে সে আতংকে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ফেলে দাও—ফেলে দাও—ওটা—

আমি আরেকটু হলে ফেলেই দিতাম, কিন্তু এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা রাজনৈতিক অনুশাসন বিজ্ঞানের বিশ্বাস সব মিলিয়ে নিজের ভেতরে একটা গোঁ এসে গেল। সাঁওতাল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় বললাম, কেন ফেলে দেব?

ছুঁলে তুমি মরে যাবে। ওটা পিশাচ—

আমি ছুঁলে মরে যাব?

হ্যাঁ। মরে যাবে—

www.MurchOna.com

আমার ভেতরে তখন একটা লোকদেখানো সাহস তৈরি হয়েছে। মূর্তিটা এক হাতে ধরে রেখে অন্য হাত সেটার কাছে নিয়ে বললাম, এই দেখ আমি এটা ছুঁইছি—

ছেলেটা চিৎকার করে উঠল এবং আমি সেটা অগ্রাহ্য করে মূর্তিটাকে ছুঁয়ে ফেললাম। একটা মূর্তি যেরকম শক্ত, প্রাণহীন, শীতল হওয়ার কথা মূর্তিটা সেরকম নয়—এটা কেমন যেন উষ্ণ এবং ছোঁয়ামাত্র আমার শরীর কেমন যেন চমকে উঠল, মনে হল ভয়ংকর একটা অশুভ কাজ করে ফেলেছি। আমি অবশ্যি সাঁওতাল ছেলেটাকে কিছুই বুঝতে দিলাম না, মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললাম, আমি কি মরে গেছি?

ছেলেটা তখনো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মূর্তিটাকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বাক্সের ভেতরে রেখে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললাম, এখন হয়েছে?

ছেলেটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, তুমি এটা কী করবে?

আমি নিয়ে যাব।

না বাবু, নিও না। অনেক বিপদ হবে তোমার—

হোক। আমি বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সাঁওতাল ছেলেটা অনেক অনুনয়-বিনয় করল, কিন্তু আমি তার কথা শুনলাম না।

সে রাতে আমি বাক্সটা খুললাম না। বাসায় গিয়ে ভালো করে গোসল করে রাতে ঘুমাতে গিয়েছি। একটু পরে পরে ঘুম ভেঙে গেল—শুধু মনে হল ঘরে বুঝি কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুম হল ছাড়া ছাড়া ভাবে আর একটার পর আরেকটা দুঃস্বপ্ন দেখে গেলাম। ভয়ংকর ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন! চিৎকার করে জেগে উঠলাম কয়েকবার।

ভোরবেলা দিনের আলোতে বাক্সটা খুলে ভেতরের মূর্তিটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করলাম। নিঃসন্দেহে মূর্তিটা মানুষের, দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে, একটা হাত দিয়ে নিজের দুটি হাঁটু, অন্য হাত দিয়ে মাথাটা ধরে রেখেছে। মানুষের স্বাভাবিক বসার ভঙ্গি এটা নয়। মূর্তিটা অস্বাভাবিক কুৎসিত, মানুষের মতো নাক চোখ মুখ সবই আছে, কিন্তু তবু মানুষের স্বাভাবিক রূপটা পায় নি। মূর্তিটা খুব বড় নয়, খুব বেশি হলে এক ফুট উঁচু হবে, এই আকারের একটা পাথরের মূর্তি যত ভারি হওয়ার কথা এটা সেরকম ভারি নয়। আবার খুব হালকাও নয়। মূর্তিটা কিসের তৈরি বলা খুব মুশকিল, মাথায় চুল রয়েছে, খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে শরীরেও লোম দেখা যায়। মনে হয় কেউ বুঝি সত্যিকার একজন বিকৃত দেহের মানুষকে কোনোভাবে চেপে ছোট করে ফেলেছে। মুখের দিকে তাকালে একই সঙ্গে কেমন যেন ঘৃণা এবং ভয় হয়। আমি মূর্তিটাকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে আবার কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে আবার কাঠের বাক্সে বন্ধ করে ফেললাম।

গল্পের এই পর্যায়ে এসে তরফদার আমার কাছে অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, সাঁওতাল ছেলেটার ভবিষ্যদ্বাণী যে আমার উপর বিপদ নেমে আসবে, কথাটা পরের দিন সত্যি প্রমাণিত হল। ঘুম থেকে উঠে দেখি পুলিশ বাসা ঘেরাও করে ফেলেছে। আগে এক-দুইবার এ রকম পরিস্থিতিতেও উদ্ধার পেয়েছি—এবারে পেলাম না, পুলিশ এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। আমরা যারা বামপন্থী

www.MurchOna.com

রাজনীতি করি আমাদের জন্যে দেশের আইনকানুন মমতাহীন। তাই আমি দীর্ঘদিনের জন্যে জেলে আটকা পড়ে গেলাম।

জেলে আমি আগেও থেকেছি, খুব কষ্টের জীবন। মজার ব্যাপার হল বড় বড় জিনিসের জন্যে লোভ হয় না, কিন্তু একটা পানের দোকান থেকে একশলা সিগারেট কিনে আগুন লাগানো একটা ঝুলন্ত দড়ি থেকে সিগারেটে আগুন ধরানোর জন্যে প্রাণ আইঢাই করতে থাকে! সারাদিন পার্টির অন্য লোকদের সাথে কথাবার্তা বলে জেলের মাঝে দিন কেটে যায়। রাত গভীর হলে যখন নিজের ছোট জায়গাটাতে ঘুমাতে যাই তখন চোখে ঘুম আসে না, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

যাই হোক এইভাবে প্রায় সাত বছর কেটে গেল। সাত বছর অনেক সময়। একাকী বসে চিন্তা করার জন্যে এ রকম দীর্ঘ সময় সবাই পায় না। সাত বছরে নিজের ভেতরেও অনেক পরিবর্তন হল। ভাবলাম যদি ছাড়া পাই জীবনটা নূতন করে শুরু করব। পুরো দেশে পরিবর্তন নয় নিজের কাছাকাছি যদি কোনো পরিবর্তন আনতে পারি সেই যথেষ্ট। অবিশ্বাস্য ব্যাপার—ঠিক তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম।

প্রথম বেশ কিছুদিন মুক্তির আনন্দ ভোগ করে পার্টিকে জানালাম আমি কিছুদিন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিশ্রাম চাই। পার্টি রাজি হল। আমি তখন একটা কলেজে চাকরি নিয়ে মফস্বল একটা শহরে চলে এসেছি। নদীর তীরে ছবির মতোন একটা কলেজ। প্রথম কয়েক সপ্তাহ কলেজের সেক্রেটারির বাসায় থাকলাম, একটু গুছিয়ে নিয়ে ছোট একটা বাসা ভাড়া করে আমি শহর থেকে আমার জিনিসপত্র নিয়ে এলাম। জিনিসপত্র বলতে অবশ্যি বেশিরভাগই হচ্ছে বই—ঘরের দেয়ালে সেলফ তৈরি করে একটা একটা করে বইয়ের বাক্স খুলছি, হঠাৎ দেখি বুড়ো সাঁওতালের সেই পিশাচের বাক্স। বুকটা ধক করে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে আমার কৌতুক মেশানো এক ধরনের কৌতূহল হল। আমি বাক্স খুলে মূর্তিটা বের করে আমার টেবিলের উপর রাখলাম। সাত বছর আগে দেখেছিলাম—তখন একটা হাত দিয়ে হাঁটু দুটি ধরে রেখেছিল, অন্য হাত ছিল মাথার উপর; এখন বিচিত্র উপায়ে দুটি হাতই নিচে নেমে এসেছে। শুধু তাই না, মাথাটা একটু নিচু হয়ে নেমে এসেছে, মুখের ভঙ্গিটা মনে হল দুঃখী। মাথায় কালো চুল ছিল এখন সেগুলো শণের মতো সাদা। শুধু তাই নয়, মনে হল শরীরের চামড়া বুড়ো মানুষদের মতো কুঞ্চিত। গত সাত বছরে এই আমি যেটুকু বুড়ো হয়েছি তার থেকে অনেক বেশি বুড়ো হয়েছে মূর্তিরূপী পিশাচটা। আমি যেরকম জেলখানায় আটকা পড়েছিলাম এই পিশাচটাও সেরকম আটকা পড়েছিল তার বাক্সে। আশ্চর্য, আমার কেমন যেন মায়া হল মূর্তিটার জন্যে। আমি বাক্সের ডালাটা খুলে দিয়ে বললাম, যা বেটা পিশাচ! আজ থেকে তোকে আর বাক্সের ভেতরে থাকতে হবে না—তুই থাকবি আমার টেবিলের উপর!

সেই থেকে মূর্তিটা আমার টেবিলের উপর থাকে—কেউ বেড়াতে এলে দেখে খুব অবাক হয়, কেউ ঘেন্নায় নাক সিটকায়, কেউ ভয় পায়, কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। এইভাবে আরো বছর দুয়েক কেটে গেল, এই মূর্তিটার যে একটা ভয়ের ইতিহাস ছিল সেটাও আমার মনে রইল না।

এ রকম সময় একদিন আমার কাছে বেড়াতে এল আমার কলেজ জীবনের বন্ধু ফয়েজ

www.MurchOna.com

আলি। অনেকদিন তার সাথে দেখা নেই, লোকমুখে খবর পেয়েছি সে নাকি চা বাগানের ম্যানেজার। সে বিয়ে করেছে বলে শুনেছিলাম, যখন আমার সাথে দেখা করতে এসেছে তখন দেখতে পেলাম তার দুটি ছেলেমেয়েও আছে। ছেলেটি ছোট, বয়স দশ। মেয়েটি বড়, তার বয়স চৌদ্দ। সারাজীবন রাজনীতি করে নানা ধরনের মানুষের সাথে মিশেছি। কিন্তু এই দুজন ছেলেমেয়েকে দেখে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি কখনো বাচ্চাদের সাথে মিশি নি এবং তাদের সাথে কীভাবে মিশতে হয় জানি না। তাদের মানসিক পরিপক্বতা কতটুকু সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। কোনো জিনিস বোঝার ক্ষমতা তাদের বড়দের থেকে বেশি, কিন্তু জীবনের জটিলতা সম্পর্কে তারা আশ্চর্যভাবে উদাসীন। আমার আগ্রহের জন্যেই হোক আর ছেলেমেয়ে দুজনের কৌতূহলের জন্যেই হোক খুব কম সময়ের মাঝেই তাদের সাথে আমার খুব ভাব হল। আমাদের কথাবার্তার একটা বড় অংশ দখল করে রইল আমার টেবিলে রাখা মূর্তিটি।

ছেলেটি যার নাম কাজল, আমার বাসায় ঢোকার দশ মিনিটের মাঝে জিজ্ঞেস করেছিল, চাচা তুমি এত বিচ্ছিরি একটা মূর্তি টেবিলে সাজিয়ে রেখেছ কেন?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই মেয়েটি, যার নাম শাওন তার ভাইকে বলল, তোর কাছে এটা শুধু বিচ্ছিরি লাগছে?

কাজল মুখ কুঁচকে উত্তর দিল, বিচ্ছিরি না তো কী?

শাওন বলল, এটা যেটুকু বিচ্ছিরি তার থেকে অনেক বেশি আশ্চর্য। এটা এত আশ্চর্য একটা মূর্তি যে এটা যে বিচ্ছিরি তাতে কিছু আসে যায় না।

মেয়েটার উত্তরটা আমার খুব পছন্দ হল। আমি বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ, মূর্তিটা খুব আশ্চর্য। সবকিছু শুনলে তোমরা আরো অবাক হয়ে যাবে।

পৃথিবীর সব মানুষই গল্প শুনতে পছন্দ করে, ছোটরা সেটা প্রকাশ করতেও এতটুকু সংকোচ করে না, তখন তখনই দুজনেই আমাকে ধরে বসল গল্প শোনার জন্যে।

আমি তখন তাদের এই মূর্তিটার পূর্ব ইতিহাস শোনালাম এবং শুনে দুজনেই মোটামুটি হতবাক হয়ে গেল। ছোট বাচ্চাদের গল্পে কোনোরকম কৌতূহল নেই এ রকম ভান করে আমার বন্ধু ফয়েজ এবং তার স্ত্রী দুজনেই গল্পটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল। গল্প শেষ হবার পর ফয়েজ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই এই মূর্তিটা হাত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়েছে?

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ সরিয়েছে। আমি জেলে যাবার আগে এটার হাত ছিল মাথার উপরে, এখন নেমে এসেছে।

ফয়েজের স্ত্রী শুকনো গলায় বলল, সত্যি?

হ্যাঁ।

তার মানে এটা সত্যিই পিশাচ?

শাওন হো-হো করে হেসে উঠে বলল, মা তুমি সত্যিই এত বোকা! পিশাচ কোথেকে আসবে?

শাওনের মা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, তোর চাচা কি তাহলে মিথ্যা কথা বলেছে?

মিথ্যা কথা বলবেন কেন? এই মূর্তিটা পাথরের তৈরি না—নরম একটা জিনিসের তৈরি, যেটা আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে—মাধ্যাকর্ষণ বলে সেটাকে।

www.MurchOna.com

আর চুল? ছোট ভাই কাজল বলল, চুল যে সাদা হয়ে গেল?

সেটা তো আরো সহজ! পৃথিবীতে কোনো পাকা রং নেই—এমন একটা জিনিস দিয়ে চুল তৈরি করেছে যেটার রং উঠে সাদা হয়ে যায়!

আমি মেয়েটার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি পুরো জিনিসটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাপারটাকে ভৌতিক হবার কোনো প্রয়োজন নেই। যে মানুষটি এই মূর্তিটা তৈরি করেছে সে দক্ষ কারিগর এবং অসম্ভব বুদ্ধিমান—এর বেশি কিছু নয়।

আমার বন্ধু ফয়েজ তার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে আমার এখানে সপ্তাহখানেক ছিল। সবাইকে নিয়ে সময়টা বেশ কেটেছে। যতক্ষণ বাসায় থেকেছি বাচ্চাগুলো মূর্তিটার আশপাশে ঘুরঘুর করেছে, যাবার দিন আমি শাওনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি মূর্তিটা নিতে চাও?

সাথে সাথে শাওনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু সে নিজেকে কষ্ট করে সংবরণ করে বলল, না না চাচা, আমি চাই না।

আমি বললাম, দেখ এটা উপহার দেবার মতো কোনো জিনিস না, তাই আমি জোর করতে পারব না। কিন্তু তুমি যদি চাও এটা নিতে পার।

সত্যি?

সত্যি।

কিন্তু আপনি যে এত কষ্ট করে যোগাড় করেছেন—

আমি মোটেও কষ্ট করে যোগাড় করি নি। কৌতূহল ছিল বলে যোগাড় করেছিলাম, এখন কৌতূহল মিটে গেছে, তুমি নিতে পার। তোমার কৌতূহল মিটে গেলে তুমি অন্য কাউকে দিয়ে দিও।

শাওনের মা-বাবা ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ করলেন না, কিন্তু আমি মূর্তিটাকে ভালোভাবে প্যাকেট করে ছোট একটা বাক্সে ভরে দিলাম।

যেদিন ফয়েজ আর তার স্ত্রী-ছেলেমেয়েকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম সেদিন এত মন খারাপ হল বলার নয়। রাতে বিছানায় শুয়ে আমার কেমন একাকী লাগতে লাগল। শুধু মনে হতে লাগল, আমারও যদি শাওন আর কাজলের মতো একটা মেয়ে আর ছেলে থাকত!

মাস ছয়েক পরের কথা। একদিন কলেজ থেকে বাসায় ফিরে এসে দেখি একটা চিঠি এসেছে, খামের উপর অপরিচিত হাতে ঠিকানা লেখা। খামটা খুলে দেখি ভেতরে শাওনের লেখা ছোট একটা চিঠি। চিঠিটা পড়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেল, কারণ এক জায়গায় লিখেছে—

ইকবাল চাচা, কেন জানি আমার মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। আমার কিছু একটা হয়েছে যেটা কোনো ডাক্তার ধরতে পারে নি। আমি দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। দিনরাত আমার বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার খুব মন খারাপ হয়ে থাকে তাই আমি শুয়ে শুয়ে সবাইকে চিঠি লিখছি....

আমি শাওনের চিঠিটা হাতে নিয়ে দীর্ঘসময় বারান্দায় বসে রইলাম। মনে হল আমার বুকের ভেতর কিছু একটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কী করব বুঝতে না পেরে আমি ঘরের ভেতর ছটফট করতে লাগলাম। সন্ধেবেলা সেক্রেটারি সাহেবের বাসা থেকে ফোন করার চেষ্টা করলাম। চা বাগানে ফোন নেই। তাই ফোন করতে হল আমার অন্য এক বন্ধুর কাছে, সেও পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারল না। তবে সেও নাকি শুনেছে শাওনের ব্লাডক্যান্সারের মতো কিছু একটা হয়েছে।

রাতে আমি দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মাঝরাতে হঠাৎ থানার পেটাঘড়িতে বারটা ঘণ্টা বাজলে আমি চমকে বিছানায় উঠে বসলাম, আমার হঠাৎ পিশাচ মূর্তিটার কথা মনে পড়ল। এটা কি হতে পারে যে সেই পিশাচটা শাওনের জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সত্যিই সেটা অশুভ একটা প্রেত, সত্যিই সেটা মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়—বুড়ো সাঁওতাল প্রায় এক যুগ আগে যেটা আমাকে বলেছিল।

আমি অতিপ্রাকৃত কোনো জিনিস বিশ্বাস করি না, কিন্তু তবুও আমি পরদিন কলেজে ছুটি চেয়ে একটি চিঠি দিয়ে ফয়েজের টি গার্ডেনের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

টি গার্ডেনটা শহর থেকে বেশ দূরে। বাস থেকে নেমে দীর্ঘপথ রিকশা করে গিয়ে বাকিটুকু হেঁটে যেতে হল। আমি যখন ফয়েজের বাসায় পৌঁছলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। তার অস্পষ্ট আলোতে চা বাগানের উঁচু-নিচু টিলাকে অপার্থিব জগতের একটা দৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল। শহর থেকে দূরে নির্জন একটা টিলার উপরে ছবির মতো বাসা। আমাকে দেখে একজন কাজের ছেলে বাসায় খবর দিতে গেল এবং কিছুক্ষণের মাঝেই ফয়েজ বের হয়ে এল। তার চেহারায় এক ধরনের ক্লান্তি—চোখের কোণে কালি, মুখে অসহায় বিষণ্ণতা। আমাকে দেখে দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, ইকবাল, এসেছিস!

হ্যাঁ। শাওনের শরীর ভালো নেই খবর পেয়ে মনটা খুব ছটফট করতে লাগল—

ভালো হয়েছে এসেছিস। মেয়েটা তোর কথা খুব বলে।

কী হয়েছে শাওনের?

ফয়েজ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, জানি না। সত্যি কথা বলতে কী কেউই জানে না। ব্লাডক্যান্সার মনে করে কিমোথেরাপি শুরু করেছিল, মেয়েটা তখন আরো দুর্বল হয়ে গেল।

ফয়েজ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলল, কেমন করে শুরু হয়েছে, ডাক্তার কী বলেছে, কী চিকিৎসা হয়েছে—সবকিছু। এখনো বিদেশে নেয়ার চেষ্টা করছে, ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেছে, কিন্তু শাওনের শরীর এত বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে ভয় হচ্ছে বেশি দেরি না হয়ে যায়। ফয়েজের কথার মাঝে তার স্ত্রী এল—তাকে দেখে মনে হল এই অল্প কয়দিনেই বয়স অনেক বেড়ে গেছে। কাজলকেও দেখলাম মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জন্যে যে চকলেটের প্যাকেটটা এনেছি সেটা খুব শখ করে খুলে একটা চকলেট বের করে হঠাৎ সেটা খাওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। আমি দেখলাম খুব সাবধানে একবার চোখ মুছে নিল—নিশ্চয়ই শাওনের কথা মনে পড়েছে।

www.MurchOna.com

শাওন ঘুমোচ্ছিল বলে আমি তখন তাকে দেখতে গেলাম না। ফয়েজ আমাকে তাদের গেস্টরুমে নিয়ে গেল। আমি জামাকাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিলাম। টি গার্ডেনে ম্যানেজারদের বাসাগুলো হয় খুব চমৎকার। এক সময় নিশ্চয়ই বিদেশি সাহেবরা থাকত। কারণ ঘরের মাঝে রয়েছে ফায়ার প্লেস—তাছাড়া ঘরটি বিশাল, উঁচু ছাদ, বড় জানালা। জানালা খুললেই দেখা যায় বিস্তৃত চা বাগান। আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে চা বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কুয়াশায় ঢাকা চা বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মন গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে যেতে লাগল।

রাত্রে খাবার পরে আমি শাওনকে দেখতে গেলাম। সে তার ঘরে বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে ছিল, অসম্ভব শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তবু তার চেহারায় এক ধরনের লাবণ্য রয়ে গেছে। আমাকে দেখে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, ইকবাল চাচা, আমি মরে যাচ্ছি!

আমার বুকের ভেতরে ধক করে উঠল, কিন্তু আমি মুখে সেটা প্রকাশ হতে দিলাম না। সে খুব একটা মজার কথা বলেছে—এ রকম ভঙ্গি করে বললাম, অসুখ হলেই মানুষ যদি মরে যেত তাহলে সারা পৃথিবীতে মানুষ থাকত সাঁইত্রিশ জন!

শাওন হেসে ফেলে আবার মুখ বিষণ্ণ করে বলল, আমি কিন্তু সত্যি মরে যাব। আমি জানি।

দূর বোকা মেয়ে! আমি গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললাম, যখন তোমার বয়স হবে তিরানব্বই, তোমার সাতচল্লিশটা নাতি-নাতনি হবে—তখন তুমি মরবে, তার আগে না।

না ইকবাল চাচা—

আমি শাওনকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমি এসেছি তোমাকে ভালো করে দিতে।

শাওন কেমন এক ধরনের জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকাল, বলল, সত্যি?

আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে বললাম, সত্যি। তোমাকে ভালো করে তারপর আমি যাব।

আমার সাথে কথা বলে সত্যি সত্যি শাওন একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শাওনকে উৎফুল্ল হতে দেখে কাজলও খুশি হয়ে উঠল। আমি শাওনের বিছানায় বসে দড়ি কাটার ম্যাজিক দেখালাম, বেকুব পাকিস্তানির গল্প বললাম, আমার ফাজিল ছাত্রদের কীর্তি শোনালাম এবং কথা বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়েছে এ রকম ভান করে বললাম, আমার বন্ধু কোথায়?

বন্ধু? শাওন অবাক হয়ে বলল, কোন বন্ধু?

মনে নেই? তোমাকে যে দিয়েছিলাম—পিশাচবন্ধু!

ও! সেই মূর্তিটা! আছে। আমার টেবিলে ছিল, জায়গা হয় না বলে নিচে নামিয়ে রেখেছে।

কাজল বলল, কাচের বাক্স তৈরি করেছে আপু—দেখতে এখন আরো ভয়ানক লাগে! একদিন হয়েছে কী শোন—

কাজল তখন কীভাবে তার বন্ধুদের এই মূর্তিটা দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছিল তার গল্প বলতে শুরু করে। আমি তার গল্প শুনতে শুনতে টেবিলের কাছে নিচু হয়ে মূর্তিটা খুঁজতে থাকি। একপাশে কিছু বইয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল, বইগুলো সরাতেই আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম, মূর্তিটা হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মুখে ক্রূর ধূর্ত একটা

www.MurchOna.com

হাসি, ঠোঁটগুলো লাল এবং যেটা আগে কখনো লক্ষ্য করি নি—মুখের ভেতর কালচে সাপের মতো একটা জিব। চোখগুলো সবসময়ে আধবোজা ছিল, এখন হঠাৎ মনে হল সেগুলো খুলে এসেছে, স্থির একটা দৃষ্টিতে সেটা তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মূর্তিটা দেখে আমার বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন কিছু একটা নড়ে যায়। আতংকে আমার শরীর কেঁপে উঠল এবং আমি প্রায় জোর করে নিজেকে শান্ত করে উঠে দাঁড়ালাম।

ততক্ষণে কাজলের গল্প শেষ হয়েছে, আমি যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু হেসে বললাম, আমার বন্ধুটি ভালোই আছে তাহলে!

শাওন কোনো কথা না বলে স্থির এক ধরনের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, মূর্তিটা আমার ঘরে নিয়ে রাখি কয়েকদিন?

শাওন কোনো উত্তর দিল না। আমি নিচু হয়ে মূর্তিটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসি। বুকের কাছে ধরে রেখেছিলাম বলেই কি না জানি না আমার নাকে হঠাৎ এক ধরনের চাপা দুর্গন্ধ এসে লাগে, মনে হচ্ছে এই মূর্তিটা থেকেই বের হচ্ছে।

আমি ঘরের টেবিলে মূর্তিটা রেখে ঘুরে দাঁড়ালাম। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, আমার কেমন জানি ভয় ভয় করতে থাকে। আমি শেষ পর্যন্ত সাহস করে মূর্তিটার দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ মনে হল সেটা একটু নড়ে উঠল। আমি চমকে উঠে তীব্র দৃষ্টিতে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল আবার বুঝি সেটা নড়ে উঠবে, কিন্তু সেটা আর নড়ল না—নিশ্চয়ই আমার মনের ভুল! কিন্তু যতবার আমি সেটা থেকে চোখ সরাই ততবারই মনে হয় সেটা একটু নড়ে ওঠে, খুব বেশি নয়; কিন্তু চোখে ধরা পড়ার জন্যে যথেষ্ট।

রাত্রি এগারটার দিকে বাসার একজন মানুষ এল আমার ঘরে ফায়ার প্লেসটি জ্বালিয়ে দিতে। আমি শুধু সিনেমায়–টিভিতে মানুষকে ফায়ার প্লেস জ্বালাতে দেখেছি সত্যি সত্যি যে এখানে কেউ ফায়ার প্লেস জ্বালাতে পারে জানতাম না। ঘরের মাঝে আগুন জ্বলছে ব্যাপারটা আমার কাছে কেন জানি অস্বাভাবিক মনে হয়। আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, লোকটা বলল, স্যার এখানে রাত্রে অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়ে। এটা জ্বালিয়ে দিলে আরামে ঘুমাবেন।

আমি বললাম, এখন তো সেরকম ঠাণ্ডা নেই।

তা নেই, কিন্তু ভোররাতের দিকে চারদিক বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আমি আর আপত্তি করলাম না, লোকটা ফায়ার প্লেসটি জ্বালিয়ে দিল। সাথে সাথে সারাঘরে আগুনের একটা নরম উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। আমি খানিকক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমার টেবিলের কাছে ফিরে এলাম, সেখানে পিশাচের মূর্তিটি অত্যন্ত ক্রূর মুখভঙ্গি করে বসে আছে।

রাত্রে আমার ঘুমাতে ঘুমাতে খুব দেরি হয়, আজকেও সেরকমই হবে ভেবে আমি বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা হালকা উপন্যাস নিয়ে বসেছি। রগরগে কাহিনী—ট্রেনে, বাসে পড়া যায় বলে শুরু করেছিলাম এখন শেষ করে দেব বলে ভাবলাম। দু-এক পৃষ্ঠা পড়তেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল, ঘরে ফায়ার প্লেস ছিল বলে ঘরে অন্ধকার নেমে না এসে এক ধরনের আধিভৌতিক আলো খেলা করতে থাকে। ফায়ার প্লেসে আগুনের শিখা নড়ছে। সেই আলোতে ঘরে বিচিত্র এক ধরনের লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে এবং সেই ছায়া

www.MurchOna.com

আগুনের শিখার সাথে সাথে নড়তে থাকে।

আমি কী করব ভাবতে ভাবতে নিচে নামতেই দরজায় ফয়েজ এসে দাঁড়াল, বলল, ইকবাল, ঘুমিয়ে গেছিস?

না। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল।

হ্যাঁ। আজকাল প্রায়ই চলে যাচ্ছে। আমাদের টি গার্ডেনের নিজস্ব ডায়নামো আছে, এমনিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তবে অনেক রাত হয়ে গেছে, আজ মনে হয় সেটা চালাবে না। এই মোমবাতিটা রাখ।

আমি মোমবাতিটা নিয়ে ফায়ার প্লেসের উপরে রেখে বললাম, ফায়ার প্লেসের আগুনে বেশ দেখা যাচ্ছে, মোমবাতি না হলেও ক্ষতি নেই।

তা ঠিক।

এখন তো আমিও আছি, কিছু দরকার হলে বলিস।

ফয়েজ নিশ্বাস ফেলে বলল, বলব।

আমি বিছানায় শুয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে ঘুমিয়ে গেলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ করে আমার ঘুম পুরোপুরি ভেঙে গেল। ঘুমটি কেন ভেঙেছে আমি জানি না। কিন্তু আমার সমস্ত স্নায়ু মুহূর্তে ঘুমের সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে একেবারে টান টান হয়ে রইল। আমার কেন জানি মনে হতে থাকে খুব অশুভ কিছু একটা ঘটছে। সেটি কী আমি জানি না। কিন্তু আমার সমস্ত চেতনা সেটার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। ফায়ার প্লেসের আগুন কমে সেখানে এখন একটা গনগনে লাল আভা, তার ম্লান আলোতে ঘরে আবছা অন্ধকার। ঘুমানোর সময় ঘরে যেরকম একটা আরামদায়ক উষ্ণতা ছিল এখন সেটা নেই, সারা ঘর হিমশীতল। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি বিছানা থেকে নামতেই নাকে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ পেলাম, পচা রক্তের অসুস্থ একটা গন্ধ। গন্ধটা কোথা থেকে আসছে কে জানে। আমি ফায়ার প্লেসের আগুনটা একটু চাগিয়ে দিতে গেলাম, কাছেই একটা সুচালো লোহার রড রাখা ছিল, সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিতেই একটা আগুনের শিখা দপ দপ করে জ্বলে উঠে ঘরে লালাভ একটা আলো জ্বলে ওঠে। আমি ঘুরে টেবিলের দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ আমার সমস্ত শরীর জমে গেল, টেবিলে কাচের বাক্সটি খালি, মূর্তিটা সেখানে নেই।

আমি আজীবন কঠিন বাস্তবতায় মানুষ হয়ে এসেছি, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ কেন জানি আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম পিশাচটি প্রাণ পেয়ে শাওনের ঘরে গেছে। যদি আমি কিছু না করি ভয়ংকর একটা কিছু ঘটে যাবে। আমি ফায়ার প্লেসের আগুন খোঁচানোর রডটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে পা টিপে টিপে বের হলাম।

আমার ঘরটি একটা হলঘরের সাথে লাগানো। সাথে একটা করিডোর। আমি করিডোর ধরে হাঁটতে থাকি আর সাথে সাথে আমার নাকে আবার সেই পচা গন্ধটা এসে লাগে। আমি পা টিপে টিপে শাওনের ঘরে এলাম, সাবধানে দরজা স্পর্শ করতেই সেটা খুলে গেল, সাথে সাথে আমার নাকে বোটকা দূষিত গন্ধটি আবার এসে ধাক্কা দেয়। আমি শাওনের ঘরে এসে ঢুকলাম, ঘরটি হিমশীতল। শাওনের বিছানার কাছে একটা ব্যাটারি

www.MurchOna.com

চার্জার লাগানো বাতি জ্বলছে, সেটা অন্ধকারকে দূর না করে আরো কেমন যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম, মশারির কাছে গিয়ে উঁকি দিতেই আমার সমস্ত শরীর আতংকে শিউরে উঠল। বিছানায় তার মাথার কাছে কুৎসিত লোমশ একজন মানুষ বসে আছে, মুখে পৈশাচিক এক ধরনের হাসি, চোখ দুটি অঙ্গারের মতো জ্বলছে। সেটি আমার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকাল। মনে হল সেই দৃষ্টি আমার সমস্ত শরীর ভেদ করে চলে গেল।

আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। নিজের ভিতরে একটা ভয়াবহ আতংক এসে ভর করেছে। তবুও দুই হাতে শক্ত করে লোহার রডটি নিয়ে এগিয়ে গেলাম। শাওনকে বাঁচিয়ে প্রাণীটাকে আঘাত করার মতো কিছু একটা জিনিস সম্ভবত আমার মাথায় কাজ করছিল। কিন্তু হঠাৎ হুটোপুটির মতো একটা শব্দ হল, আমি দেখলাম প্রাণীটি সেখানে নেই। মনে হল ঘরের মাঝে কিছু একটা ছুটোছুটি করছে, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। টেবিলটা নড়ে উঠল হঠাৎ, সেলফ থেকে দুটো বই নিচে এসে পড়ল, শাওনের বিছানাটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। আমি দুই হাতে শক্ত করে লোহার রডটা ধরে রেখে দাঁড়িয়ে থাকি। যে জিনিসকে চোখে দেখা যায় না তাকে আঘাত করা যায় কি না সেটা একবারও আমার মাথায় এল না। ঘরের দরজা হঠাৎ হুট করে খুলে গেল। সাথে সাথে ঘরের সব হুটোপুটি থেমে গেল।

আমি শাওনের কাছে ছুটে গেলাম। তার গলার কাছে খানিকটা রক্ত, আমি তার হাত স্পর্শ করে বুকের কাছে মাথা নামিয়ে আনলাম। দেখলাম খুব ধীরে ধীরে তার বুক উঠছে–নামছে, সে নিশ্বাস নিচ্ছে—এখনো বেঁচে আছে শাওন।

আমি মশারি নামিয়ে শাওনের ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে এলাম। দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই দেখি টেবিলের উপর কাচের বাক্সটাতে মূর্তিটা আবার ফিরে এসেছে। আমি দুই হাতে লোহার রডটা ধরে মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেলাম। ফায়ার প্লেসের আগুনে স্পষ্ট দেখলাম এর মুখের পাশে রক্ত লেগে আছে, মূর্তিটা আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার জিবটা বের করে তার মুখের রক্ত চেটে খেয়ে নেয় একবার।

অমানুষিক আতংকে আমি তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। লোহার রডটা উপরে তুলে আঘাত করতেই ঝন ঝন করে কাচের বাক্সটা ভেঙে গেল। মূর্তিটা তখন টেবিলের উপর স্থির হয়ে বসে আছে, আমার মনে হতে থাকে এটি আসলে কোনো মূর্তি নয় এটা মূর্তিমান বিভীষিকা—যেভাবেই হোক এটাকে আমার ধ্বংস করতেই হবে। আমি আবার লোহার রডটা তুলে এটাকে আঘাত করতে গেলাম। হঠাৎ মূর্তিটা টেবিল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার হাত বিশাল আকার নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসে। আমি অন্ধের মতো চোখ বন্ধ করে আঘাত করলাম, ভয়ংকর একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। হঠাৎ দেখি মূর্তিটা ছিটকে ফায়ার প্লেসের আগুনের মাঝে গিয়ে পড়েছে। মাংসপোড়া বিশ্রী গন্ধে ঘরটা কলুষিত হয়ে গেল। চড়চড় শব্দ করে পুড়তে থাকে মূর্তিটা। আমি দেখতে পাই তার মাঝে সেটা কিলবিল করে নড়ছে—

ফয়েজ আর তার স্ত্রী যখন নেমে এসেছে তখন ফায়ার প্লেসে মূর্তিটার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। আমার ঘরে এসে ফয়েজ ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে

www.MurchOna.com

ইকবাল?

আমি লোহার রডটা নিচে রাখতে রাখতে বললাম, ঘরে বাদুড় না কী যেন ঢুকেছিল, মারতে গিয়ে ভুল করে মূর্তিটাকে মেরে বসেছি! ছিটকে গিয়ে পড়েছে আগুনে—

ফয়েজের স্ত্রী বলল, ভালো হয়েছে পুড়েছে আপদ! কী বিশ্রী গন্ধ বের হয়েছে দেখেছ?

আমি কোনো কথা বললাম না। ফয়েজ বলল, বিকট একটা চিৎকার শুনতে পেলাম—

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, আমি নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে করেছি! হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গিয়ে মাথার ঠিক নেই—

ফয়েজের স্ত্রী বলল, শাওনকে দেখে আসি।

আমি বললাম, হ্যাঁ এত চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই।

শাওনের ঘরে গিয়ে দেখি সে বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। আমাদের দেখে বলল, তোমরা এত রাতে কী করছ?

তার মা বলল, তোকে দেখতে এলাম—

শাওন হেসে বলল, ভালো করেছ মা! আমার কী মনে হচ্ছে জান?

কী?

আমি ভালো হয়ে যাব।

আমি বললাম, এক শ বার তুমি ভালো হয়ে যাবে!

আমি একটু বিছানা থেকে উঠি?

ফয়েজ ভয় পাওয়া গলায় বলল, পারবি উঠতে?

পারব বাবা।

ফয়েজ এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, শাওন তাকে ধরে উঠে দাঁড়াল। ফয়েজের স্ত্রী হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বলল, সে কী, তোর গলায় রক্ত কিসের?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, মশা! নিশ্চয়ই মশা! চা বাগানের মশা রক্ত খেয়ে ঢোল হয়েছিল, শাওন নিশ্চয়ই ঘুমের মাঝে মেরে বসেছে।

তরফদার গল্প শেষ করে থামলেন, আমি আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বললাম, তারপর শাওনের কী হল? ভালো হয়ে গেল?

হ্যাঁ। অনেকদিন আগের কথা, এখন বিয়ে হয়ে গেছে। ভালো আছে শাওন।

তাকে কোনোদিন বলেছেন গল্পটা?

না বলি নি। এ রকম আজগুবি একটা গল্প বলার ইচ্ছে করে না।

আনিস ঘাড় বাঁকা করে বলল, তাহলে আমাদের যে বললেন?

তোমাদের বলেছি মাঝরাতে, যখন বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, একটা ভুতুড়ে আবহাওয়া, ভালো গল্পই ভুতুড়ে শোনায় তাই! কাল ভোরে তোমরা ভাববে, তরফদার সাহেব কী গাঁজাখুরি গল্পই না করতে পারে! কী, ভাববে না?

আমি মাথা নাড়লাম, মনে হয় ভাবব।

www.MurchOna.com

সবুজ গুণ্ডা ও দিলু সাইন্টিস

নূতন ক্লাসে ওঠার পর থেকে দিলুর দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। শুধু দিলু না, ক্লাসের সব ছেলের ওপরেই একটা ভয়াবহ বিপদ নেমে এসেছে। দিলু যেহেতু সাইজে ছোট, চোখে ভারি চশমা এবং একটু শান্ত ধরনের, তাই তার বিপদটা একটু বেশি। বিপদটা যার থেকে এসেছে তার নাম সবুজ, যদিও সবাই তাকে জানে 'সবুজ গুণ্ডা' হিসেবে। সে এতদিন উপরের ক্লাসে ছিল, সবাই ডাকত সবুজ ভাই বলে, এই বছর ফেল করে দিলুদের ক্লাসে চলে এসেছে। সবুজ অনেক কষ্ট করে এতদিনে মাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত এসেছে। কিন্তু এর মাঝেই সে গুণ্ডা হিসেবে খুব নাম করে ফেলেছে। বড় হলে সে যে বিখ্যাত সন্ত্রাসী হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক দলগুলো তখন নিশ্চয়ই তাকে ভাড়া করে নিয়ে যাবে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে, কাটারাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে। সবুজের সাইজ তার ক্লাসের সবার দুইগুণ। এমনিতেই বয়স বেশি তার ওপর দুই বেলা বলাইয়ের রেস্টুরেন্টে 'গোশ-পারাটা' খেয়ে খেয়ে সে মস্ত তাগড়া জোয়ান। ক্লাস সেভেনে থাকতে সে বিড়ি খাওয়া শিখেছে, এইটে আসতে না আসতেই গঙ্গা নাপিতের দোকানে দাড়ি কামিয়ে আসতে হয়।

সবুজ যেরকম পাহাড়ের মতো একটা দানব, দিলু ঠিক সেরকম ছোটখাটো হালকাপাতলা। চোখে বড় বড় চশমা থাকায় এবং কান দুটি একটু বড় হওয়ায় তাকে অনেকটা খরগোশের মতো দেখায়। দিলুর মতো ছেলেদের জন্যে সবুজ ছিল একটা ভয়াবহ আতংক। শেষ বেঞ্চে জানালার কাছে সবুজের একটা সিট রিজার্ভ করা আছে, প্রথম দিন দিলু না জেনে সেখানে বসে পড়েছিল। সবুজ এসে তার বেঞ্চে বই দেখে হুংকার দিয়ে বলল, এইখানে কোন শালা বই রেখেছে?

দিলু ভয়ে ভয়ে বলল, আমি।

ইঁদুরের বাচ্চা, তুই জানিস না, এটা আমার জায়গা?

দিলু দুর্বল গলায় বলল, যার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে বসে না?

কী? আমার মুখের ওপর কথা? সবুজ এগিয়ে এসে দিলুর শার্টের কলার ধরে ওপরে

www.MurchOna.com

তুলে দেয়ালে ঠেসে ধরল। চোখ লাল করে হাত মুঠি করে নাকের ওপর তুলে বলল, এক ঘুসিতে নাক ভেতরে ঢুকিয়ে দেব, হারামির বাচ্চা।

দিলু চি চি করে বলল, আর বসব না।

সবুজ তাকে ছেড়ে দিয়ে হাতের ধাক্কায় সবগুলো বই ছুড়ে দিল, ব্যাকরণ খাতা জানালা দিয়ে গিয়ে পড়ল বাইরে একবারে নালার মাঝে।

ব্যাকরণ ক্লাসে স্যার জিজ্ঞেস করলেন, খাতা ভেজা কেন? সবুজ ঘুসি পাকিয়ে দিলুকে বুঝিয়ে দিল সত্যি কথা বললে তার বারটা বাজিয়ে দেবে। তাই সে আর সত্যি কথা বলতে পারল না। খামাখা স্যারের গালি খেল ক্লাসে।

এরপর থেকে দিলু চেষ্টা করত সবুজকে এড়িয়ে যেতে, কিন্তু কাজটা সহজ নয়। সবুজ যখন তখন এসে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলত। যদি কোনো গোলমাল পাকাতে না পারত তাতেও ক্ষতি নেই, শুধু শুধু হঠাৎ করে পেছন থেকে এসে মাথায় একটা চাঁটি মেরে বসত কিংবা ঘাড়ে একটা থাবড়া। সবুজের সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল দিলুর চশমাটা খুলে নেয়া। দিলুর চশমার পাওয়ার এত বেশি যে সে চশমা খুলে নিলে এক হাত দূরের জিনিসও ভালো করে দেখতে পারে না। সবুজ সেই চশমা খুলে নিয়ে হাত উঁচু করে ধরে রেখেছে আর দিলু চশমার জন্যে কাকুতি-মিনতি করছে—এটা প্রায় নিত্যদিনের দৃশ্য।

শুধু দিলুকে নয়, ক্লাসের অন্য সবাইকেও নানাভাবে উৎপাত করার সবুজের নানারকম উপায় আছে। তার একটা হচ্ছে সাপ্তাহিক চাঁদা। ক্লাসের সবাইকে চাঁদা তুলে সবুজের জন্যে 'গোশ-পারাটা'র পয়সা তুলতে হয়। কেউ যদি পয়সা আনতে ভুলে যায় তার জন্যে সবুজের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তার মাঝে একটা হচ্ছে চুলের মাঝে চিউইংগাম লাগিয়ে দেয়া। চুলে ভালোমতো চিউইংগাম লেগে গেলে সেই চিউইংগাম আর তোলা যায় না। তখন তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে কাঁচি দিয়ে চুলের সেই অংশ কেটে ফেলা। ক্লাসের প্রায় অর্ধেক ছেলের মাথার চুলে ছোটবড় খাবলে খাওয়া অংশ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় কারা কারা সবুজের 'গোশ-পারাটা'র পয়সা সময়মতো আনতে পারে নি। তার আরেকটা শাস্তি হচ্ছে শার্টের ভেতরে বিষপিঁপড়া ছেড়ে দেয়া। পিঁপড়াগুলো ছাড়ার আগে সবুজ সেগুলোকে একটু রগড়ে দেয়। রগড়ে দেয়া পিঁপড়াগুলো খেপে আগুন হয়ে থাকে। কাজেই তাদের শার্টের ভেতর ছেড়ে দিলে বুকে-পিঠে যা একটা কামড় দেয় সে আর বলার মতো না।

ক্লাসের ছেলেদের সবুজের জন্যে 'গোশ-পারাটা'র পয়সা যোগাড় করা ছাড়াও আরো নানা ধরনের কাজ করতে হয়। টিফিনের ছুটিতে তার ঘাড় আর পিঠ টিপে দিতে হয়, পেন্সিল ভোঁতা হয়ে গেলে সেগুলো চোখা করে দিতে হয়, হোমওয়ার্ক করে দিতে হয়। ক্লাস শুরু হওয়ার আগে একেকদিন একেক জনকে এক ঘণ্টা আগে থেকে বসে থাকতে হয়, সবুজ তখন তাদের খাতা থেকে হোমওয়ার্ক টুকে নেয়। দিলুর অবস্থা আরো খারাপ, তার হাতের লেখা ভালো না, দেখতে অনেকটা সবুজের হাতের লেখার মতো। কাজেই তাকে প্রায় রোজই সবুজের একটা হোমওয়ার্কের খাতা নিয়ে যেতে হয়। নিজের হোমওয়ার্ক করার আগে দিলুকে সবুজের খাতায় তার জন্যে হোমওয়ার্কগুলো করে দিতে হয়। সবুজ ধাতানি দিয়ে রেখেছে হাতের লেখা যেন হুবহু তার মতো হয়, একটু উনিশ-বিশ হলে সে তার লাশ ফেলে দেবে। ব্যাপারটি অসম্ভব কিছু নয় তাই দিলু রাত জেগে সবুজের হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসে।

www.MurchOna.com

এসব কথা স্যারদের বলার উপায় নেই, তাদের ক্লাসের আরিফ একবার চেষ্টা করেছিল, তার যে অবস্থা হয়েছিল সেটা দেখার পর আর কেউ কখনো সাহস করে নি।

সব মিলিয়ে দিলুর অবস্থা খুব খারাপ। অন্য কোনো মানুষ হলে এতদিনে নিশ্চয়ই পাগল টাগল হয়ে যেত, শুধু দিলু বলে এখনো টিকে আছে। দিলুর কথা আলাদা, কারণ সে হচ্ছে সাইন্টিস, শব্দটা সায়েন্টিস্ট হওয়ার কথা। কিন্তু সাইন্টিস বলতে সুবিধা বলে সবাই সাইন্টিসই বলে। সবুজ যেরকম বড় হয়ে সন্ত্রাসী হবে সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই, ঠিক সেরকম দিলু বড় হয়ে সায়েন্টিস্ট হবে সে বিষয়েও কারো কোনো সন্দেহ নেই। তার স্কুলের ব্যাগ একটা ছোটখাটো ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি। সেখানে আছে চুম্বক, ইলেকট্রিক তার, লেন্স, প্রিজম, টর্চলাইটের ব্যাটারি, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের শিশি, ছুরি, কাঁচি এবং বিজ্ঞানের বই। যখন যেখানে সময় পায় সে তার মোটা মোটা বিজ্ঞানের বই নিয়ে বসে পড়ে। যদি হাতের কাছে কোনো বই না থাকে তখনো তার সমস্যা হয় না। চোখমুখ কুঁচকে বিজ্ঞানের কোনো সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসে যায়। কিছু একটা তৈরি করবে বা আবিষ্কার করবে—বিশাল একটা যন্ত্র যেটা সবুজকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখে একটু পর পর মাটিতে একটা আছাড় দেবে তার কথা সে প্রায়ই ভাবে।

কিন্তু এ রকম যন্ত্র তৈরি করা সোজা না। কাজেই দিলু আর সবাই সবুজের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে দিলু পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়েছে ভাবলে খুব ভুল হবে। প্রায় সময়েই মাথার পেছনে হাত দিয়ে দিলু যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা ভাবে, সব সময়েই যে সেটা ব্ল্যাকহোল বা ইলেকট্রন পজিট্রন সেটা সত্যি নয়, অনেক সময়েই সেটা সবুজকে কীভাবে জব্দ করা যায় সেটা।

দিলু অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছে সবুজকে তারা জব্দ করতে পারবে না, তাকে জব্দ করতে দরকার তার থেকেও জাঁদরেল কেউ। সেটা হতে পারে একমাত্র ইদরিস স্যার। ইদরিস স্যার তাদের বিজ্ঞান পড়ান, বিজ্ঞানের মতো এ রকম মজার একটা বিষয় ইদরিস স্যারের হাতে পড়ে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থায় আছে। স্যার কথাবার্তা বলেন কম, রাগারাগি করেন আরো কম, কিন্তু হঠাৎ করে রেগে গেলে একেবারে ভয়ংকর অবস্থা হয়ে যায়। কোনোভাবে যদি ইদরিস স্যারকে সবুজের ওপর রাগিয়ে দেয়া যায়, মনে হয় কিছু একটা গতি হয়ে যেতে পারে। দুই বছর আগে স্যার ভীষণ রেগে একজনকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। সেভাবে যদি এই বিষফোড়াটাকে বের করে দেয়া যায় তাহলে কী চমৎকারই না হত। দিলু চোখমুখ কুঁচকে ভাবতে থাকে। কোনোই কি উপায় নেই?

একদিন এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়! সাথে সাথে সে উঠে দাঁড়ায়, হাত পেছনে নিয়ে সে ঘরে এক পাক হেঁটে আসে, মনে হয় কিছু একটা করে ফেলা যেতে পারে। দিলু মুখ কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে, কয়েকদিন খাটাখাটুনি করতে হবে, কিন্তু মনে হয় কাজ হয়ে যাবে।

দিলু পরদিন ভোর থেকেই কাজ শুরু করে দিল। প্রথমে তৈরি করল একটা ইনডাকশন কয়েল। এক টুকরা লোহার ওপরে একটা তার প্যাঁচিয়ে নিল ভালো করে, সেটা হল প্রাইমারি কয়েল। তার ওপর খুব পাতলা এনামেল কোটেড তার প্যাঁচাতে শুরু করল। অনেক হাই ভোল্টেজ তৈরি করতে হবে। কাজেই প্যাঁচাতে হবে অনেকক্ষণ, সেটা হবে

www.MurchOna.com

সেকেন্ডারি কয়েল। ভালো করে না প্যাঁচালে তারগুলো ওলটপালট হয়ে যায়, তাই খুব সাবধানে প্যাঁচাতে হল দিলুর। কয়েক ঘণ্টা সময় বের হয়ে গেল এক ধাক্কায়। ইনডাকশন কয়েলটা দাঁড়া করার পর খুব সাবধানে পরীক্ষা করল একবার, দুই আঙুলে দুই মাথা চেপে ছোট একটা ব্যাটারিতে ছোঁয়ালো দিলু, প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খেয়ে প্রায় ছিটকে উঠল সে! চমৎকার হয়েছে ইনডাকশন কয়েলটা–দিলুর মুখে একগাল হাসি ফুটে ওঠে, সায়েন্টিস্ট মানুষ ভালো জিনিসের কদর করতে জানে।

ছোট কাজটা শেষ হয়েছে, এখন বড় কাজটা বাকি, স্কুলে গিয়ে সবুজের বেঞ্চে কিছু তার লাগানো। এমনিতে স্কুলে গিয়ে মনে হয় লাগানো যাবে না, কিছু একটা কায়দা করতে হবে। স্কুলের দফতরী কালিপদকে বলে ছুটির পর যদি ক্লাসঘরে ঢোকা যায় সবচেয়ে ভালো হয়। কালিপদ মানুষটি নির্ভেজাল, গিয়ে যদি সহজ একটা গল্প বলা যায় যে ভুল করে খাতা ফেলে এসেছে বা সেরকম একটা কিছু, মনে হয় ঢুকতে দেবে।

সেদিন বিকালবেলাতেই দিলু বাকি কাজটা করে রাখল। খুব সরু কিছু তার বেঞ্চের ওপর বিছিয়ে দিয়ে দুই পাশে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিল। সবুজ তার চাকু দিয়ে বেঞ্চে আঁকিবুকি কেটে রেখেছে—কাজেই সেখানে নূতন করে কয়েকটা লাইন টেনে তামার তারগুলো বসাতে কোনো সমস্যা হল না। তারের দুই মাথা টেবিলের নিচে দিয়ে নিয়ে এল বেঞ্চের অন্য পাশে। সেখানে ব্যাটারিটা থাকবে। হাত দিয়ে ব্যাটারির নিচে কানেকশন দেয়া যাবে কাউকে না দেখিয়ে। দিলু কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখল সবকিছু চমৎকার কাজ করছে।

পরদিন যখন ইদরিস স্যার এলেন ক্লাস নিতে, স্যার মোটেও আন্দাজ করতে পারলেন না যে কিছুক্ষণের মাঝেই এখানে একটা মস্ত বড় নাটক ঘটতে থাকবে। স্যার পড়ানো শুরু করলেন। বিজ্ঞানের ক্লাস, অথচ কিছুক্ষণের মাঝেই স্যার এমন একঘেয়ে গলায় কথা বলতে শুরু করলেন যে পুরো ক্লাসের চোখে প্রায় ঘুম নেমে এল। অন্য যে কোনো দিন হলে দিলুর চোখেও ঘুম নেমে আসত, কিন্তু আজকে অন্য ব্যাপার, সে ধৈর্য ধরে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব বেশি উত্তেজিত হলে স্যার খানিকটা তোতলানো শুরু করেন, মুখ খিঁচিয়ে কীভাবে জানি সেটা আবার সামলে নেন।

মিনিট দশেক পর যখন স্যারের মুখে কথা আটকে গেল, স্যার তোতলানো শুরু করলেন। দিলু টেবিলের নিচে হাত দিয়ে ব্যাটারির কানেকশনটা জুড়ে দিল। তারপর যা একটা ব্যাপার ঘটল সেটা বলার মতো নয়। সবুজ দুই হাত টেবিলের ওপর রেখে ঘুম ঘুম চোখে বসেছিল, হঠাৎ প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খেয়ে বিকট চিৎকার করে সে প্রায় উড়ে তার সিট থেকে বের হয়ে এল। ক্লাসের সব ছেলে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সবুজের দিকে। স্যার চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

সবুজ কথা বলতে পারছিল না। কোনোমতে তোতলাতে তোতলাতে বলল, ই–ই–ই—

স্যারের মুখ একেবারে কালো হয়ে এল, চোখ লাল করে কী একটা বলতে গিয়ে স্যারও তোতলাতে লাগলেন, কী–কী–কী—

সবুজ আবার বলল, ই–ই–ই, তারপর কোনোমতে একটা ধাক্কা দিয়ে শেষ করে বলল, ই–ইলেকট্রিক শক।

www.MurchOna.com

ইদরিস স্যার দাঁতামুখ খিচিয়ে বললেন, ইলেকট্রিক শক? ফাজলেমি কর ক্লা–আ–আ–সে? বস চুপ করে।

সবুজ আবার তার জায়গায় গিয়ে বসল সাবধানে। এদিকে সেদিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। দিলু নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল, যদি সূক্ষ্ম তারগুলো দেখে ফেলে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সবুজ দেখল না।

স্যার আবার পড়াতে শুরু করলেন। মিনিটখানেক যাবার পর আবার স্যারের মুখে কথা আটকে গেল, দিলু তখন তার বেঞ্চের নিচে হাত দিয়ে সাবধানে ব্যাটারির কানেকশন জুড়ে দিল, আর সাথে সাথে সবুজ আবার চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠে।

ইদরিস স্যারের চেহারা এবার হল দেখার মতো। তার আর কোনো সন্দেহ রইল না সবুজ তার তোতলামোকে ভ্যাংচানোর চেষ্টা করছে। চোখমুখ পাকিয়ে বললেন, বে–বে–বেয়াদব ছেলে। তু–তু–তুমি ফাজলেমি ক–ক–কর?

সবুজ বলল, ফা–ফা–ফা ফাজলেমি করি না স্যার।

স্যার আরো রেগে গেলেন, হুংকার দিয়ে বললেন, চু–চু–চুপ কর।

সবুজ আবার তখন ভয়ে ভয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। আবার ক্লাস শুরু হল। সবুজের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। নিজের জায়গায় বসে তাকাচ্ছে এদিক–সেদিক। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। ঠোঁট নড়ছে তার, মনে হয় দোয়াকালাম কিছু একটা পড়ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

স্যার আবার পড়াতে শুরু করলেন। পড়া এবারে কিছুতেই জমল না। সমস্ত ক্লাসে এক ধরনের চাপা ভয়। স্যার এবার কথায় কথায় আটকে যাচ্ছেন। যখন হঠাৎ খুব ভালোভাবে তোতলাতে শুরু করলেন দিলু আবার ব্যাটারিতে কানেকশন দিল। ঘেয়ো কুকুরকে আচমকা লাথি দিলে যে রকম 'কেউ' করে চিৎকার করে ওঠে সবুজ ঠিক সেরকম শব্দ করে আবার লাফিয়ে ওঠে। তার চোখেমুখে আতংক, তোতলাতে তোতলাতে বলল, ই–ই–ই–ই—

কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই ইদরিস স্যার এসে সবুজের চুলের ঝুঁটি ধরে ক্লাস থেকে বের করে নিয়ে গেলেন, যাবার আগে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলে গেলেন, আ–আ–আমার সাথে মা–মা–মামদোবাজি? তো–তো–তোমাকে আমি সিধে করে ছাড়ব।

ইদরিস স্যার সবুজকে কী করেছিলেন জানা গেল না, কিন্তু সবুজ আর ক্লাসে ফিরে এল না। স্কুল ছুটির পর সবাই যখন বাসায় যাচ্ছে, সবুজকে দেখা গেল গঙ্গা নাপিতের দোকানে শুকনো মুখে বসে আছে। ক্লাসের ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত?

সবুজ নিশ্বাস ফেলে বলল, বের করে দিয়েছে স্কুল থেকে। মনে করেছে আমি স্যারের সাথে টিটকারি মেরেছি।

মারিস নি?

না। সত্যি সত্যি ইলেকট্রিক শক।

এখনো হচ্ছে?

সবুজ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তবে আগের মতো এত বেশি না।

www.MurchOna.com

দিলু অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখল, এমন ভয় পেয়েছে যে এখন এমনিতেই ইলেকট্রিক শক খেয়ে যাচ্ছে। সবুজ হঠাৎ দিলুর দিকে তাকাল। বলল, দিলু—

দিলু ভয়ে ভয়ে বলল, কী?

তুই তো সাইন্টিস, অনেক বইপত্র পড়িস। কী হয়েছে ব্যাপারটা জানিস?

দিলু মাথা চুলকে বলল, অনেকদিন আগে একটা বইয়ে পড়েছিলাম, শরীরে যখন কেমিক্যালের গোলমাল হয়ে যায় তখন নার্ভাস সিস্টেম দিয়ে ওলটপালট সিগন্যাল যায়, কখনো মনে হয় ব্যথা, কখনো ইলেকট্রিক শক, কখনো চুলকানি—একেক জনের একেক রকম।

কী করতে হয় তখন?

একটা মাত্র চিকিৎসা—বিশ্রাম।

বিশ্রাম?

হ্যাঁ। এখন স্কুলে আসা ঠিক না। কমপক্ষে এক বছর বিশ্রাম নেয়া দরকার।

নাম কী অসুখটার?

মনে নাই। গুভুটাইটিস না সে রকম কী যেন!

গুভুটাইটিস? কী আজব নাম!

হ্যাঁ নামটা খুব আজব। অসুখটাও তো আজব।

দিলু হেঁটে যেতে যেতে দেখল দুরারোগ্য গুভুটাইটিস রোগাক্রান্ত সবুজ পাংশু মুখে গঙ্গা নাপিতের দোকানে বসে আছে।

www.MurchOna.com

আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে সেই ছেলেবেলা থেকে। রঞ্জুর বয়স তখন চার, তার আব্বা-আম্মা ভাবলেন সে এখন বড় হয়ে গেছে, তার আলাদা ঘরে ঘুমানো উচিত। বড় বোন শিউলির ঘরে তার জন্যে ছোট খাট দেয়া হল, সেখানে রইল রঙচঙে চাদর আর ঝালর দেয়া বালিশ। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে যেন একা একা না লাগে সে জন্যে মাথার কাছে রইল তার প্রিয় খেলনা ভালুক। গভীর রাতে আম্মা দেখেন রঞ্জু ঘুম থেকে উঠে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? ঘুম থেকে উঠে এলি যে?

রঞ্জু তার আব্বা আর আম্মার মাঝখানে শুতে শুতে বলল, ভালুকটা ঘুমাতে দেয় না।

আম্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, খেলনা ভালুক তোকে ঘুমাতে দেয় না?

না। যখনই ঘুমাতে যাই খামচি দেয়। রঞ্জু শার্টের হাতা গুটিয়ে দেখাল, এই দেখ।

আম্মা দেখলেন আঁচড়ের দাগ। বিকেলবেলা পাশের বাসার ছোট মেয়েটির পুতুল কেড়ে নিতে গিয়ে খামচি খেয়েছিল, নিজের চোখে দেখেছেন। মাঝরাতে সেটা নিয়ে রঞ্জুর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন না।

পরদিন তার বিছানায় খেলনা ভালুকটা সরিয়ে সেখানে ছোট একটা কোলবালিশ দেয়া হল। কিন্তু আবার মধ্যরাতে দেখা গেল রঞ্জু গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। আম্মাকে ডেকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিজের জন্যে জায়গা করতে করতে বলল, খুব দুষ্টুমি করছে।

কে?

ময়ূরটা।

কোন ময়ূর?

ওই যে দেয়ালে।

আম্মার মনে পড়ল সেই ঘরের দেয়ালে শিউলি একটা ময়ূরের ছবির পোস্টার লাগিয়ে রেখেছে, বললেন, সেটা তো ছবি।

www.MurchOna.com

রঞ্জু মাথা নাড়ল, ছবি ছিল। রাত্রিবেলা ছবি থেকে বের হয়ে এসে পায়ে ঠোকর দেয়। এই দেখ আমার বুড়ো আঙুলে ঠোকর দিয়েছে।

অন্ধকারে আম্মা রঞ্জুর পায়ের নখ বা ময়ূরের কাজকর্ম দেখার উৎসাহ অনুভব করলেন না। রঞ্জুকে পাশে শোয়ার জায়গা করে দিলেন।

ব্যাপারটা এইভাবে শুরু হয়েছে—প্রয়োজনে রঞ্জু চমৎকার গল্প ফেঁদে বসে। আব্বা বললেন, ছোট মানুষ সত্যি-মিথ্যে গুলিয়ে ফেলে। বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে।

আরেকটু বড় হলে দেখা গেল তার গল্প বলার অভ্যাস বেড়ে গেছে। আগে প্রয়োজনে বানিয়ে বানিয়ে বলত আজকাল অপ্রয়োজনেও বানানো শুরু করেছে। পাশের বাসার ছোট মেয়েটি দুপুরবেলায় রঞ্জুর সাথে খেলতে আসে। একদিন আম্মা শুনলেন রঞ্জু তাকে বলছে, আমার আম্মা আসলে পরী।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, পরী?

হ্যাঁ। রঞ্জু মুখ গম্ভীর করে বলল, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমার আম্মা ছোট একটা প্যান্ট পরে জানালা দিয়ে উড়ে উড়ে বের হয়ে যান।

সত্যি?

হ্যাঁ।

ছোট প্যান্ট কেন পরতে হয়?

রঞ্জু হাসতে হাসতে বলল, শাড়ি পরে কেউ কখনো উড়তে পারে নাকি!

মেয়েটি রুদ্ধশ্বাসে খানিকক্ষণ রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমার আম্মা উড়ে উড়ে কোথায় যায়?

রঞ্জু মাথা নেড়ে বলল, জানি না। হাতে করে আম্মা একটা বন্দুক নিয়ে যান। মনে হয় সব চোর ডাকাত বদমাশদের সাথে সারারাত ফাইট করেন।

তোমার আম্মা চোর ডাকাতদের সাথে ফাইট করেন?

মনে হয় করেন।

মেয়েটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর কাঁপা গলায় বলে, তোমার আম্মা যদি পরী হন তাহলে তুমিও কি পরী?

রঞ্জু হেসে ফেলল, বলল, দুর বোকা! মেয়ে পরীদের বলে পরী। ছেলে পরীদের বলে পরা।

পরা?

হ্যাঁ। আমি হচ্ছি পরা।

তুমি উড়তে পার?

এখনো পারি না। পাখা গজায় নি তো। পাখা গজালেই উড়ব।

রঞ্জুর আম্মা লক্ষ্য করলেন গল্পের এই পর্যায়ে রঞ্জু শার্ট খুলে পিঠ বের করে মেয়েটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সেখানে পাখা বের হওয়ার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কি না। মেয়েটি টিপেটুপে জানাল, এখনো দেখা যাচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে যে কোনোদিন বেরিয়ে যেতে পারে।

রাতে আম্মা যখন আব্বাকে ঘটনাটা জানালেন, আব্বা ছোট হাফপ্যান্ট পরে আম্মা বন্দুক নিয়ে বের হয়ে যান শুনে এত জোরে জোরে হাসতে শুরু করলেন যে ব্যাপারটা নিয়ে আম্মা

www.MurchOna.com

আর কিছুই বলতে পারলেন না। আব্বা অনেকক্ষণ হেসে একসময় হাসি থামিয়ে আম্মাকে বললেন, আমার কী মনে হয় জান?

কী?

তোমার ছেলে বড় হয়ে খুব বড় একজন লেখক হবে! অসম্ভব হবে তার কল্পনাশক্তি।

আম্মা শুকনোমুখে বললেন, লেখক না হয়ে যদি পলিটিশিয়ান হয়ে যায়! যেভাবে গাঁজাখুরি গল্প বানিয়ে যাচ্ছে আমার তো ভয়ই হচ্ছে—

আরো কিছুদিন যাওয়ার পর মনে হল আব্বার আশা থেকে আম্মার আশংকাই সত্যি হবার সম্ভাবনা বেশি। রঞ্জুর লেখালেখির দিকে বেশি ঝোঁক নেই, ক্লাস সেভেনে একবার বাংলায় ফেল করে ফেলল। প্রোগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে আম্মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, তুই বাংলায় ফেল করে ফেললি?

রঞ্জু উদাস মুখে বলল, কবি রবীন্দ্রনাথও তো পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। কবি নজরুলও করেছিলেন। আইনস্টাইনও করেছিলেন।

আম্মা রঞ্জুর কান ধরে বললেন, তোকে এই খবর কে দিয়েছে?

রঞ্জু সাবধানে নিজের কান বাঁচিয়ে নিয়ে বলল, কেন ফেল করেছি শুনলে তুমি রাগ করবে না, আম্মা।

কেন?

রঞ্জু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি সকালবেলা, স্টেশনারি দোকানের কাছে দেখি এক জাপানি সাহেব। সে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।

তুই তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিলি?

কেমন করে দিব? সে জাপানি ভাষা ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না।

তুই তাহলে বুঝলি কেমন করে সে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে?

রঞ্জু মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, কেউ রাস্তা হারালে তাকে দেখেই বোঝা যায়! বেচারার এমন বিপদ তাই তাকে সাহায্য করতে হল—কাজ চালানোর মতো একটু বাংলা শেখাতে হল।

আম্মা চোখ লাল করে বললেন, ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুই তাকে বাংলা শিখিয়ে দিলি!

সেইজন্যেই তো পরীক্ষার হলে যেতে দেরি হয়ে গেল। তার ওপর—

তার ওপর কী?

তার ওপর লোকটার সাথে জাপানিজ ভাষায় কথা বলতে বলতে মাথার মাঝে বাংলার বদলে শুধু জাপানি কথা—বাংলা সমাস লিখতে গিয়ে জাপানিজ সমাস লিখে ফেলি—

আম্মা রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন।

যত দিন যেতে থাকল রঞ্জুর বানিয়ে গল্প বলার অভ্যাস আরো বেড়ে যেতে থাকল। ব্যাকরণ ক্লাসে একদিন হোমওয়ার্ক না করে চলে এসেছে, স্যার রেগে গিয়ে একটা হুংকার দিলেন—অন্য কেউ হলে ভয়ে কেঁদে ফেলত। কিন্তু রঞ্জু ঘাবড়াল না, হাসিমুখে বলল, স্যার আমি হোমওয়ার্কটা করেছি স্যার।

www.MurchOna.com

করেছিস তাহলে আনিস নি কেন?

সেটা একটা বিশাল গল্প স্যার।

বিশাল গল্প? স্যার চোখ পাকিয়ে তাকালেন।

রঞ্জু স্যারের দৃষ্টি উপেক্ষা করে গল্প শুরু করে দিল : আমার বড় বোনের নাম শিউলি, গভমেন্ট স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। তার খুব চা খাওয়ার শখ। রাতে আমার আম্মাকে বলল, সে চা খাবে। আম্মা ধমক দিয়ে বললেন, এত রাতে চা খাবি কী! ঘুমাতে যা।

শিউলি আপা খুব মন খারাপ করে ঘুমাতে গেল। কিন্তু মনের মাঝে রয়ে গেছে চা খাওয়ার শখ। গভীর রাতে দেখলাম সে বিছানা থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করল। চোখ বন্ধ করে ঘুমের মাঝে হাঁটতে শুরু করেছে—ইংরেজিতে এটাকে বলে স্লিপ ওয়াকিং। যখন কেউ স্লিপ ওয়াকিং করে তখন তাকে ডিস্টার্ব করতে হয় না। আমি তাই তাকে ডিস্টার্ব করলাম না। দেখলাম সে রান্নাঘর থেকে এক কেতলি পানি নিয়ে এল। তারপর আমার হোমওয়ার্কের খাতাটা নিয়ে হোমওয়ার্কের পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিল। সেই আগুনে কেতলির পানি গরম করে মাঝরাতে চা তৈরি করে খেল। এ রকম সময়ে ডিস্টার্ব করতে হয় না স্যার—তাই আমি কিছু বলতে পারলাম না।

স্যার কোনো কথা না বলে থ হয়ে রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্লাসের মাঝে সাদাসিধে ছেলে বলে পরিচিত আজমল নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ডিস্টার্ব করলে কী হয়?

রঞ্জু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্যার আজমলের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর হতভাগা! আর একটা কথা বলেছিস তো মাথা ভেঙে ফেলব।

আজমল অবাক হয়ে ফিসফিস করে বলল, স্যার আমার উপর এত রেগে গেলেন কেন? আমি কী করেছি!

বছরখানেক পরে রঞ্জুকে নিয়ে সমস্যা আরো বেড়ে গেল—কারণ তখন হঠাৎ করে সে সায়েন্স ফিকশান পড়া আরম্ভ করেছে। সায়েন্স ফিকশানের উদ্ভট কাহিনী পড়ে তার মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেল—আগে বানিয়ে বানিয়ে সে যেসব গল্প বলত সেগুলো তবু কোনো না কোনোভাবে সহ্য করা যেত। কিন্তু আজকাল যেগুলো বলে সেগুলো আর সহ্য করার মতো নয়। একবার দুদিন তার ক্লাসে দেখা নেই, তৃতীয় দিনে সে মহা উত্তেজিত হয়ে দুদিন আগের একটা খবরের কাগজ নিয়ে ক্লাসে হাজির হয়েছে। সবাই ক্রিকেট খেলা নিয়ে গল্প করছে সে তাদের থামিয়ে দিয়ে খবরের কাগজটা তাদের সামনে খুলে ধরে বলল, দেখ—

সবাই খবরের কাগজটার দিকে তাকাল—দেখার মতো এমন কিছু নেই, প্রতিদিন যা থাকে তাই আছে খবরের কাগজে, রাজনৈতিক নেতাদের বড় বড় কথা, মন্ত্রীদের বোলচাল আর খুন জখম ছিনতাইয়ের বর্ণনা। আজমল জিজ্ঞেস করল, কী দেখব?

রঞ্জু একটু অধৈর্য হয়ে বলল, তারিখটা দেখ!

দুদিন আগের তারিখ, এর মাঝে দেখার কী আছে কেউ বুঝতে পারল না। রঞ্জু বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে বলল, এখনো বুঝতে পারছিস না?

উপস্থিত সবাই মাথা নেড়ে বলল, না।

www.MurchOna.com

আমি একটু আগে হকারের কাছ থেকে কাগজটা কিনেছি, এক ঘণ্টাও হয় নি।

আজমল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, হকার পুরোনো কাগজ বিক্রি করে?

রঞ্জু অধৈর্য হয়ে বলল, দুর গাধা! পুরোনো কাগজ কিনব কেন, আজকের কাগজটাই কিনেছি। কিনে আসছি, হঠাৎ রাস্তার মোড়ে গাছের আড়ালে দেখি চকচকে সিলিণ্ডারের মতো একটা জিনিস। কেমন একটু কৌতূহল হল, তাই দেখতে গেলাম, কাছে যেতেই সাঁৎ করে গোল একটা দরজা খুলে গেল। বিশ্বাস করবি না, ভেতরে দুজন মানুষ বসে আছে, তাদের গায়ের রং সবুজ। আমাকে দেখে একজন বলল, এই খোকা শুনে যাও—

আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম, একে অপরিচিত মানুষ, তার উপর গায়ের রং সবুজ। ভাবলাম উল্টোদিকে একটা দৌড় দিই। কিন্তু মানুষগুলোর চোখ দুটি দেখে থেমে গেলাম, কারণ চোখ দেখে মনে হল খুব বিপদে পড়েছে। আমি কাছে গেলাম, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

একজন বলল, আমরা হারিয়ে গেছি।

হারিয়ে গেছ? আমি অবাক হয়ে বললাম, এটা হচ্ছে তেমাথা, একটু সামনে গেলে আমাদের স্কুল, তার সামনে হচ্ছে বাসস্টেশন—

সবুজ রঙের দুই নম্বর মানুষটা বলল, না, না তুমি বুঝতে পারছ না, আমরা জায়গার ক্ষেত্রে হারাই নি। আমরা সময়ের ক্ষেত্রে হারিয়ে গেছি।

সময়ের ক্ষেত্রে?

হ্যাঁ। এটা হচ্ছে একটা টাইম মেশিন। এক হাজার বছর অতীতে একটা মিশন শেষ করে ভবিষ্যতে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ হারিয়ে গেলাম। কোন সময়ে আছি জানি না। তাই টাইম মেশিনটাকে কেলিব্রেট করতে পারছি না।

আমি বললাম, তাই বল! তার মানে তোমরা জানতে চাও আজকে কয় তারিখ?

হ্যাঁ।

এই দেখ—বলে আমি তাদের সামনে খবরের কাগজটা খুলে ধরলাম, আটাইশ তারিখ–শনিবার।

সবুজ চেহারার মানুষ দুজন তাই দেখে খুব খুশি হয়ে গেল, আমার হাত ধরে কয়েকবার হ্যান্ডশেক করে বলল, তুমি খুব উপকার করেছ আমাদের, কী চাও তুমি বল।

আমি তো আর বলতে পারি না এইটা চাই সেইটা চাই, তাই ভদ্রতা করে বললাম কিছুই চাই না আমি।

লোক দুজন তখন আমাকে এত বড় একটা জিরকোনিয়ামের ক্রিস্টাল দিয়ে বলল, এইটা নাও।

আমি বললাম, কী বলছ, এত বড় একটা ক্রিস্টাল দিয়ে আমি কী করব—হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাবে। যদি সত্যিই কিছু দিতে চাও তাহলে তোমাদের টাইম মেশিনে করে আমাকে ঘুরিয়ে আন।

লোক দুজন বলল, ওঠ তাহলে।

আমি ভেতরে ঢুকলাম।

একজন জিজ্ঞেস করল, অতীতে যাবে না ভবিষ্যতে?

আমি বললাম, ভবিষ্যতেই যাই।

কতদিন যেতে চাও?

আমি বললাম, বেশিদিন না। এক-দুই দিন।

একজন তখন এটা সুইচ টিপে দিল, ঘটাং ঘটাং করে একটা শব্দ হল তারপর দরজা খুলে বলল, এসে গেছি!

আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নি, বাইরে এসে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কী বার আজকে? সে বলল সোমবার!

আজমল সাদাসিধে ছেলে, সে মাথা নেড়ে বলল, আসলেই আজকে সোমবার।

রঞ্জু চোখ বড় বড় করে বলল, তার মানে শনি রবি এই দুটি দিন আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে! কী আশ্চর্য দেখলি?

সবাই রঞ্জুকে এতদিনে চিনে গেছে, তারা মুখ টিপে হেসে আবার ক্রিকেটের গল্পে ফিরে গেল। রঞ্জু রেগে গিয়ে বলল, আমার কথা তোরা বিশ্বাস করলি না? ভাবছিস আমি গুল মারছি? তাহলে এই খবরের কাগজটা আমার হাতে এল কোথা থেকে? বল তোরা—দুদিন আগের খবরের কাগজ আমার হাতে এখন কেমন করে এল?

তার প্রশ্নের কেউ সদুত্তর দিতে পারল না, রঞ্জু তখন বইপত্র রেখে খবরের কাগজ নিয়ে বের হয়ে গেল অন্য কাউকে গল্প শোনানোর জন্যে।

রঞ্জুর এই গল্প বলা রোগের সবচেয়ে ভুক্তভোগী হচ্ছে তার বড় বোন শিউলি। বড় বোনেরা সাধারণত নানাভাবে ছোট ভাইদের উৎপাত করে থাকে, কিন্তু শিউলি মোটেও সেরকম মেয়ে না, সে ধৈর্য ধরে রঞ্জুর গল্প শুনত, গল্পের যেখানে বিস্ময় প্রকাশ করার কথা সেখানে বিস্ময় প্রকাশ করত, যেখানে দুঃখ পাওয়ার কথা সেখানে দুঃখ পেত, যেখানে খুশি হওয়ার কথা সেখানে খুশি হত। গল্প শুনে সে কখনো বিরক্ত হত না এবং যত আজগুবি গল্পই হোক না কেন সব সময় সে এমন ভান করত যেন সে গল্পটা বিশ্বাস করেছে।

রঞ্জুর সায়েন্স ফিকশানের প্রতি বাড়াবাড়ি প্রীতি জন্ম নেবার পর শিউলির জন্যেও গল্পগুলো হজম করা কঠিন হয়ে পড়তে শুরু করল। প্রায় প্রতিদিনই রঞ্জু এসে মহাকাশের কোনো এক আগন্তুকের কথা বলতে লাগল। কোনদিন সেই আগন্তুক তাকে ব্ল্যাকহোলের গোপন রহস্যের কথা বলে গেছে তার কাছে কাগজ কলম ছিল না বলে লিখে রাখতে পারে নি, লিখে রাখতে পারলেই পৃথিবীতে হইচই শুরু হয়ে যেত। কোনদিন একটা ফ্লাইং সসার থেকে বিদঘুটে কোন প্রাণী লেজারগান দিয়ে তাকে গুলি করতে চেষ্টা করেছে আর সে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে, আবার কোনদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে একটা জারুল গাছের নিচে চতুষ্কোণ একটা উজ্জ্বল আলো দেখে সেখানে উঁকি মারতেই ভিন্ন একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ঝলক দৃশ্য দেখে এসেছে।

একদিন রঞ্জু এসে শিউলিকে খুব উত্তেজিত গলায় বলল, আপু, যা একটা কাণ্ড হয়েছে!

শিউলি চোখেমুখে যথেষ্ট আগ্রহ ফুটিয়ে বলল, কী হয়েছে?

ফুটবল খেলে ফিরে আসছি, দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে নূতন যে বিল্ডিংগুলো তৈরি হচ্ছে তার ভিতর দিয়ে শর্টকাট মারছি। মাঝামাঝি জায়গাটায় যেখানে ইটগুলো সাজিয়ে রেখেছে সেখানে আসতেই হঠাৎ একটা রোবট বের হয়ে এল।

www.MurchOna.com

শিউলি চোখ বড় বড় করে বলল, রোবট?

হ্যাঁ। চকচকে স্টেনলেসের শরীর। মাথার দুই পাশ থেকে আলো বের হচ্ছে, চোখগুলো সবুজ। আমাকে দেখে হাত তুলে নাকীস্বরে বলল, এ–ই–ছে–লে–কো–থা–য়–যা–ও?

শিউলি হাসি গোপন করে বলল, তাই নাকি? আমি জানতাম শুধু পেত্নীরা নাকীস্বরে কথা বলে, রোবটরাও তাহলে নাকীস্বরে কথা বলে?

রঞ্জু মাথা নেড়ে বলল, তাই তো দেখলাম। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, বাসায় যাই।

রোবটটা বলল, তু–মি–কি–আ–মা–র–এ–ক–টা–উ–প–কা–র–ক–র–তে–পা–র–বে?

আমি বললাম, কী উপকার? তখন সেটা বলল তার নাকি ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি তো অবাক! রোবটের আবার খিদে পায় নাকি? তখন রোবটটা আমাকে বলল তাদের যখন খিদে পায় তখন তাদের ব্যাটারি খেতে হয়। মোটা মোটা ডি সাইজের ব্যাটারি।

শিউলি বিস্ময়ের ভান করে বলল, তাই নাকি?

রঞ্জু মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

তুই তখন ব্যাটারি কিনে দিলি?

হ্যাঁ—দোকান থেকে দুই ডজন ব্যাটারি কিনে এনে দিলাম, আর আমার সামনে কচ কচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

ব্যাটারি কেনার পয়সা পেলি কই?

রোবটটাই দিল, তার কাছে সব দেশের টাকা আছে।

শিউলি হাসি গোপন করে বলল, তুই যে রোবটের এত বড় উপকার করলি সে তোকে কিছু উপহার দিল না।

রঞ্জু মনমরা হয়ে বলল, দিয়েছে।

কী দিয়েছে?

রঞ্জু পকেট থেকে কয়েকটা তেঁতুলের বিচি বের করে বলল, এইগুলো।

তেঁতুলের বিচি?

এগুলো দেখলে মনে হয় সাধারণ তেঁতুলের বিচি, আসলে এর থেকে যে গাছ বের হয় সেটা থেকে ক্যান্সারের ওষুধ বের করা যাবে।

শিউলি গম্ভীর গলায় বলল, তাহলে এগুলো যত্ন করে রাখিস, আবার হারিয়ে না যায়।

হ্যাঁ রাখব।

রঞ্জু তখন তেঁতুলের বিচি খুলে তার ছোট বাক্সটার মাঝে গুছিয়ে রাখল।

এর কয়দিন পরের কথা। আম্মা নানাকে একটা চিঠি লিখছেন। পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ যখন বলপয়েন্ট কলম দিয়ে লিখছে তখন আম্মা কোন একটা বিচিত্র কারণে ফাউন্টেন পেন ছাড়া লিখতে চান না। চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ আম্মার ফাউন্টেন পেনে কালি শেষ হয়ে গেল। আম্মা রঞ্জুকে ডেকে বললেন, কালির দোয়াতটা নিয়ে আয় তো।

রঞ্জু দোয়াতটা নিয়ে আসছিল আর ঠিক তখন কোনো কারণ নেই কিছু নেই হঠাৎ করে সে হোঁচট খেল, সাথে সাথে হাত থেকে কালির দোয়াত ছিটকে গেল উপরে তারপর

www.MurchOna.com

আছড়ে পড়ল নিচে—আর কিছু বোঝার আগে দোয়াত ভেঙে এক শ টুকরা হয়ে মেঝেতে কার্পেটে কালি ছড়িয়ে একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা হল।

আম্মা তখন এমন রেগে গেলেন যে সে আর বলার মতো নয়। তাঁর কথা শুনে মনে হতে লাগল যে কালির দোয়াত নয় রঞ্জু বুঝি সাভার স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলেছে! রঞ্জুকে বকতে বকতে আম্মা তার বারটা বাজিয়ে ছাড়লেন—এমন এমন কথা বলতে লাগলেন যে রঞ্জুর মনে হতে লাগল যে বেঁচে থাকার বুঝি কোনো অর্থই হয় না। খানিকক্ষণ সে ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদল তারপর সে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল।

নির্জন ছাদ, পাশে কয়েকটা নারকেলগাছ, বাতাসে তাদের পাতা ঝিরঝির করে নড়ছে। আকাশের মাঝামাঝি অর্ধেকটা চাঁদ, তাতেই চারদিকে আলো হয়ে আছে। ছাদে এসে রঞ্জুর মনটা একটু শান্ত হল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অনেক দূরের একটা নিওনসাইনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ঠিক করল বড় হয়ে সে আম্মাকে একটা কঠিন শাস্তি দেবে। যখন সে অনেক বড়লোক হবে তখন আম্মার জন্মদিনে দশ হাজারটা কালির বোতল কিনে এনে আম্মার ঘরটা পুরোপুরি বোঝাই করে দিয়ে বলবে, মনে আছে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটা কালির বোতলের জন্যে আমাকে কত বকেছিলেন? এইখানে আছে দশ হাজার কালির বোতল—আমি এখন এইগুলো ভাঙব। এই বলে একটা মুগুর নিয়ে সে প্রচণ্ড জোরে বোতলগুলোতে মারতে থাকবে—কালি ছিটকে যাবে ডানে বামে—আম্মা ভয় পেয়ে চিৎকার করতে থাকবেন, সবাই ছুটে আসবে দেখতে—

ঠিক এ রকম সময় রঞ্জুর মনে হল পেছনে কেমন জানি এক ধরনের শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। একটু অবাক হয়ে পেছনে ঘুরে সে যেটা দেখল তাতে তার সমস্ত শরীর শীতল হয়ে গেল, গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দেবে দেবে করেও সে অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রাখল।

রঞ্জু দেখল তার পেছনে দুই মানুষ সমান উঁচু জায়গাতে গোলমতোন একটা মহাকাশযান ভাসছে। সেটি বিরাট বড়, প্রায় পুরো ছাদ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক নিচে একটা গোল গর্ত মতোন সেখান থেকে নীল আলো বেরিয়ে আসছে। মহাকাশযানটি প্রায় নিঃশব্দ, শুধু খুব হালকা একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ, খুব কান পেতে থাকলে শোনা যায়।

রঞ্জু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। প্রথমে মনে হল সে বোধহয় পাগল হয়ে গেছে—পুরোটা একটা দৃষ্টিবিভ্রম, কিন্তু ভালো করে তাকাল সে, বুঝতে পারল এটা দৃষ্টিবিভ্রম নয় সত্যি সত্যি দেখছে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে নীল আলোতে হঠাৎ একটা আবছা ছায়া দেখতে পায়, ছায়াটা কিলবিল করে নড়তে থাকে তারপর হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়, মনে হতে থাকে অনেকদিন না খেয়ে একটা মানুষ শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে—শুধু মাথাটা না শুকিয়ে আরো বড় হয়ে গেছে, সেখানে গোল গোল চোখ, নাক নেই, সেখানে দুটো গর্ত। মুখের জায়গায় গোল একটা ফুটো দেখে মনে হয় বুঝি খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

প্রাণীটি কিলবিল করতে করতে এক ধরনের শব্দ করল। শব্দটি অদ্ভুত। শুনে মনে হয় একজন মানুষ হাঁচি দিতে গিয়ে থেমে গিয়ে কেশে ফেলেছে। রঞ্জু কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, ওয়েলকাম জেন্টলম্যান।

www.MurchOna.com

কেন জানি তার ধারণা হল ইংরেজিতে কথা বললে সেটা এই প্রাণী ভালো বুঝতে পারবে। প্রাণীটা তখন হঠাৎ করে পরিষ্কার বাংলায় বলল, শুভসন্ধ্যা মানবশিশু।

রঞ্জু অবাক হয়ে বলল, তুমি বাঙালি?

প্রাণীটা বলল, না, আমি বাঙালি নই। তবে আমি তোমার গ্রহের যে কোনো মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি। এই দেখ—বলে প্রাণীটা পরিষ্কার চাটগাঁয়ের ভাষায় বলল, "আঁসার বজা কুড়ার বজা ফত্যি আড়ত বেচি বাজার গরি বাড়িত আইলে ইসাব লয় তোঁর চাচি"। ফ্লাইং সসার এবং তার রহস্যময় প্রাণী দেখে রঞ্জু যত অবাক হয়েছিল তার মুখে চাটগাঁয়ের কথা শুনে সে তার থেকে বেশি অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সাথে সাথে আরো একটা ব্যাপার ঘটল, তার ভেতর থেকে ভয়টা পুরোপুরি দূর হয়ে গেল। সে খুক খুক করে একটু হেসে ফেলে বলল, তোমার নাম কী?

তোমাদের মতো আমাদের নামের প্রয়োজন হয় না। আমরা এমনিতেই পরিচয় রাখতে পারি।

রঞ্জু বলল, আমার নাম রঞ্জু। তোমাকে দেখে আমার খুব মজা লাগছে।

কেন?

আমার তো সায়েন্স ফিকশান পড়তে খুব ভালো লাগে—তাই!

প্রাণীটা কাশির মতো একটা শব্দ করে বলল, সায়েন্স ফিকশান হচ্ছে গাঁজাখুরি।

তু-তুমি সায়েন্স ফিকশান পড় না?

আমাদের কিছু পড়তে হয় না। আমরা এমনিতেই সব জানি।

সত্যি?

সত্যি। আমরা তোমার কাছে এসেছি একটা কারণে। আমাদের এক্ষুনি ক্র্যাব নেবুলাতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের ফুয়েল ট্যাংকে একটা লিক হয়েছে সেটা সারানোর সময় নেই। তুমি সে জন্যে আমাদের সাহায্য করবে।

রঞ্জু অবাক হয়ে বলল, আমি?

হ্যাঁ তুমি।

কীভাবে?

তোমার বাম পকেটে একটা চিউইংগাম আছে। সেটা চিবিয়ে নরম করে দাও, আমাদের ট্যাংকের লিকটাতে সেটা লাগিয়ে নেব।

রঞ্জু অবাক হয়ে গেল, সত্যি সত্যি তার বাম পকেটে চিউইংগামের একটা স্টিক আছে। সেটা মুখে পুরে চিবিয়ে সেটা নরম করে মুখ থেকে বের করে প্রাণীটার দিকে এগিয়ে দেয়। প্রাণীটা বলল, আরো কাছে আস। আমি এই নীল শক্তি বলয় থেকে বের হতে পারব না।

রঞ্জু আরেকটু এগিয়ে গেল। প্রাণীটা তখন তার তুলতুলে নরম হাত দিয়ে চিউইংগামটা নিয়ে বলল, অনেক ধন্যবাদ।

রঞ্জু বলল, এখন তোমরা যাবে?

হ্যাঁ। তুমি আমাদের সাহায্য করেছ বলে আমরা তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই।

রঞ্জু কাঁপা গলায় বলল, কী উপহার?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আমরা যেখানে থাকি, সেই ক্র্যাব নেবুলার একটা ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি। তোমাদের গ্রহতেই পেয়েছি, আমরা অনেকগুলো নিয়ে যাচ্ছি আমাদের বাসস্থানে। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি একটা। হাত বাড়াও—

উত্তেজনায় রঞ্জুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। সে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সেখানে গোলমতোন একটা জিনিস এসে পড়ল।

প্রায় সাথে সাথেই নীল আলোটা ভেতরে ঢুকে যায় আর ফ্লাইং সসারের মতো জিনিসটা ঘুরপাক খেতে খেতে উপরে উঠে যেতে থাকে। রঞ্জু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল সেটা ছোট হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

গোলাকার জিনিসটা হাতে নিয়ে সে সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়। সিঁড়ির আলোতে জিনিসটা ভালো করে দেখল এবং সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সেটা একটা আমড়া। সাথে সাথে তার মনে পড়ল আমড়ার আঁটিটা আসলে সত্যিই ক্র্যাব নেবুলার মতো দেখতে। মহাকাশের এক বিচিত্র প্রাণী তার সাথে এ রকম ফাজলামি করবে কে জানত!

রঞ্জু হতচকিতের মতো নিজের ঘরে এসে ঢুকল, শিউলি তাকে দেখে এগিয়ে আসে, কী রে রঞ্জু তুই কোথায় ছিলি, খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

রঞ্জু নিচু গলায় বলল, ছাদে।

ছাদে একা একা কী করছিলি?

রঞ্জু খানিকক্ষণ শিউলির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, কিছু না।

কিছু না?

না।

শিউলি একটু অবাক হয়ে রঞ্জুর দিকে ঘুরে তাকাল, তাকে ভালো করে দেখল তারপর জিজ্ঞেস করল, তোর কী হয়েছে? এ রকম করে তাকিয়ে আছিস কেন?

কী রকম করে?

মনে হচ্ছে তুই ভূতটুত কিছু একটা দেখে এসেছিস!

রঞ্জু কিছু বলল না। শিউলি আবার জিজ্ঞেস করল, তোর হাতে ওটা কী?

আমড়া।

আমড়া! শিউলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমার জন্যে এনেছিস?

রঞ্জু দুর্বল ভাবে হেসে বলল, তুমি নেবে?

দে—শিউলি রঞ্জুর হাত থেকে আমড়াটা নিয়ে ওড়না দিয়ে মুছে একটা কামড় দিয়ে বলল, উহ! কী টক! কোথায় পেলি এই আমড়া?

রঞ্জু কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কোথায় আবার পাব? সবাই যেখানে পায় সেখানেই পেয়েছি!

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.murchona.com

Amra O Crab Nebula by Md. Jafar Iqbal

Murchona
Sumbol of Music

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com